প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০

প্রকাশক
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
৩,১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর
শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৪

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল একটি দ্যুতিমান ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বকে নানা দিক থেকে দেখার ফল এই গ্রন্থ। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গ সাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত।' বীরবলের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বর্তমান গ্রন্থরচনায় প্রেরণা জুগিয়েছে।

এই গ্রন্থপাঠে যদি বীরবল সম্পর্কে পাঠকসমাজের আগ্রহ বাড়ে, তবে শ্রম সার্থকজ্ঞান করব।

৭ই জুন, ১৯৬০

প্রেসিডেন্সি কলেজ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ১২

শ্রীবিনয়কুমার ভট্টাচার্য

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

অভিন্নহৃদয়যুগলেষু

বর্তমান লেখকের ঃ

বাংলা সমালোচনার ইতিহাস

বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য

বীরবল ও বাংলা সাহিত্য

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ

কথাসাহিত্য-জিজ্ঞাসা

রবীন্দ্র-মনীষা

রবীন্দ্র-সমীক্ষা

লেখকের মুখোমুখি

স্মৃতি-বিস্মৃতি

সম্পাদনা ঃ

রবীন্দ্র-বিতান

সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের কাব্যসঞ্চয়

যুগ্ম-সম্পাদনা ঃ

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সূচী

১ | বীরবল

শাহান্‌ শা আকবর দিল্লীতে রাজসভায় পাত্রমিত্র নিয়ে বসে আছেন। নানা রহস্যালাপ চলছে। হঠাৎ আকবর প্রশ্ন করলেন, বীরবল, দিল্লীতে কতগুলি কাক আছে? বীরবল কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, বাদশা', এই শহরে ৯৯,৯৯৯টি কাক আছে। আপনি গুনে দেখলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন। যদি দেখেন কাক এই সংখ্যার চেয়ে কিছু বেশী, তাহলে জানবেন, দিল্লীর উপকণ্ঠ থেকে রাজধানীর কাকদের স্বজন-বান্ধবরা দেখা করতে এসেছে। আর যদি দেখেন, এই সংখ্যার কিছু কম সংখ্যক কাক দিল্লীতে আছে, তাহলে জানবেন তারা দিল্লীর বাইরে তাদের আত্মীয়-বন্ধু কাকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও শিষ্টাচার দেখাতে গিয়েছে। এই জবাব পেয়ে শাহান শা নিরুত্তর, তাঁর মুখ বন্ধ হল।

মুখবন্ধ স্বরূপ রাজা বীরবল সম্পর্কে যে গল্পটি উদ্ধার করেছি সে ধরনের বহু গল্প তাঁর নামে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এর মধ্যে বীরবলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, পরিহাসনৈপুণ্য, কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তিপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই গুণগুলির চর্চা বাংলা সাহিত্যে যিনি করেছিলেন, তিনিই 'বীরবল' ওরফে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। পাবনার বিখ্যাত চৌধুরী বংশের সন্তান প্রমথ চৌধুরী কেবল বংশ-অর্থ-কৌলীন্যে অভিজাত বংশের ছিলেন না, মনের ক্ষেত্রেও তিনি অভিজাত ছিলেন। তাঁর বাল্যকাল কেটেছে পাবনায়, কৈশোর কৃষ্ণনগরে, যৌবন বিলেত ও কলকাতায়, বার্ধক্য কলকাতায় ও শান্তিনিকেতনে। তিনি আসলে পূর্ব বা পশ্চিম কোনো বঙ্গেরই লোক ছিলেন না, তিনি বিদ্যানগরের বিদগ্ধ নাগরিক। রাণী ভিক্টোরিয়া-বংশ-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের প্রজা নন, কালিদাসের উজ্জয়িনী ও পেরিক্লস্‌-এর আথেন্স নগরের তিনি বাসিন্দা। একাল সে-কালের জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর অবাধ ভ্রমণের ছাড়পত্র ছিল। তিনি

রাজশেখর। অনুশীলিত দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস বলেছেন, সে দেহ মেদচ্ছেদকৃশোদর, প্রগুণ, প্রাণসার, উৎসাহযোগ্য; সে দেহ ভার বর্জন করেছে, সার অর্জন করেছে, তা অদম্য প্রাণশক্তির আধার, সে দেহ পলিমাটি-লতাপাতা খাওয়া হোঁৎকা হাতীর দেহের মত নয়, তা গিরিচর নাগের দেহের মত। এই বর্ণনা অনুশীলিত মনের যথার্থ পরিচয়। প্রমথ চৌধুরী এই অনুশীলিত মনের অধিকারী ছিলেন।

॥ ২ ॥

'বীরবল' ছদ্মনামটি কেন গ্রহণ করেছেন, তার উত্তর দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন: 'আমি যখন দেশের লোককে রসিকতাচ্ছলে কতকগুলি সত্য কথা শোনাতে মনস্থ করি, তখন আমি না ভেবেচিন্তে বীরবলের নাম অবলম্বন করলুম'। ('বীরবল' চৈত্র ১৩৩৩)। এ নাম তিনি ভেবেচিন্তেই অবলম্বন করেছিলেন, তা উক্ত প্রবন্ধ পড়লেই বোঝা যায়। বীরবল-চরিত্রের দুটি গুণ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল—বীরবলের অনন্যসাধারণ প্রখর পরিহাসপ্রবণতা এবং যুক্তিধর্মিতা। বীরবল উইট ও রীজন-এর ভক্ত ছিলেন এবং শাহান্ শা আকবরকে সে ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। ইমোশন-এর চর্চা প্রমথ চৌধুরী করেন নি, তিনি র‍্যাশনালিজম্-এর চর্চা করেছেন। স্যানিটি (কাণ্ডজ্ঞান), ক্ল্যারিটি (প্রসাদগুণ) ও রিজন (যুক্তি) আশ্রয় করলে জীবনে অনেক দুঃখ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এ কথা প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন। বিখ্যাত ফরাসি লেখক আঁদ্রে মোরোয়া বলেছেন, 'The most civilised way of being sad is to be humorous'। প্রমথ চৌধুরী এ কথা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেছেন, 'আমি বাঙ্গালী জাতির বিদূষক মাত্র। তবে রসিকতাচ্ছলে সত্য কথা বলতে গিয়ে ভুল করেছি। কারণ নিত্য আমি দেখতে পাই যে, অনেকে আমার সত্য কথাকে রসিকতা বলে, আর আমার রসিকতাকে সত্য কথা বলে ভুল করেন। এখন এ ভুল শোধরাবার আর উপায় নেই। পাঠকেরা যে আমার লেখার ভিতর সত্য না পান, রস পেয়েছেন, এতেই আমি কৃতার্থ।" (তদেব)। এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গদিগ্ধ মন্তব্যের আলোয় প্রমথ চৌধুরীর মনের চেহারাটা আমাদের কাছে স্পষ্ট

প্রতিভাত হয়। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালি জীবনে ইমোশন্-এর অতিচর্চার ফলে মননশীলতার হানি হয়েছে এবং সেজন্য আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে জ্ঞানের ফসল ফলে নি। এই কারণে আমাদের মানসিক অধঃপতন ঘটেছে। এই অধঃপতন থেকে বাঙালি মনকে রক্ষা করবার জন্য প্রমথ চৌধুরী কলম ধরেছেন, একথা একাধিক বার ঘোষণা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী যে বীরবল, ভারতচন্দ্র, ফরাসি সাহিত্যিক ও ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রীদের ভক্ত ছিলেন, তা এজন্য যে এঁদের রচনায় ইমোশন্-এর অতিচর্চা নেই, রিজন্ বা যুক্তির আশ্রয় আছে।

তিনি আমাদের মানসিক যৌবনের চর্চা করার উপদেশ দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ শারীরিক যৌবনের চর্চা করেছে ও সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য এই যৌবনের জয়গানে ও তার অবসানে বিলাপে মুখরিত। সবুজপত্রে তিনি ইউরোপীয় যৌবন—যা চিরস্থায়ী মানসিক যৌবন—তার চর্চা এবং ইউরোপীয় প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আমাদের মন সর্বদা ঘুমিয়ে থাকে। তাকে জাগিয়ে তোলাই প্রমথ চৌধুরীর ও সবুজপত্রের সাধনা। এজন্যই তিনি সাহিত্যের চর্চায় নেমেছেন। 'সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়। কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।' ('সবুজপত্রের মুখপত্র' বৈশাখ ১৩২১)। সবুজপত্রে তিনি জাড্য, আলস্য ও তামসিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন: "আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যবৈরাগ্যকে ব্রহ্মানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই।' (তদেব)। 'বীরবল' প্রমথ চৌধুরীর রচনায় তাই মানসিক যৌবনের নিত্য মহোৎসব, সেখানে যুক্তি ও বুদ্ধির রাজত্ব, ইমোশন্ ও আবেগের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। গৌড়ভাষার মৃদুমন্দ স্রোতে সাহিত্যরসকে "পাকস্থ" করার সাধনাই তাঁর জীবনসাধন। ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রধান প্রভেদ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "ও দেশের লোক 'অজরামরবৎ' বিদ্যা ও অর্থের চর্চা করে, আর আমরা 'গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা' ধর্মচিন্তা করি।" ('মহাভারত ও গীতা' কার্তিক ১৩২৩)। ইউরোপের জীবনদর্শনই তাঁর পছন্দ এবং বাঙালি তার জীবনে একেই গ্রহণ করুক, এই তাঁর একান্ত অভিলাষ।

॥ ৩ ॥

বাঙালি বীরবল তাঁর সাহিত্যে হাসির চর্চা করেছেন। বাঙালিকে তিনি হাসির চর্চা করতে বলেছেন কেননা হাসির জন্ম সত্যদর্শন থেকে। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনিই দার্শনিক; আর হাস্যরসিক সে অর্থে জীবনের দার্শনিক। বীরবল ও ভারতচন্দ্রের কিস্‌সা ও কাব্যে হাসির ছড়াছড়ি। হয়ত সর্বত্র শিষ্টতা রক্ষিত হয় নি, তথাপি হাসির আলোয় জীবনকে সত্যরূপে দেখা যায়। 'হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিষ্টফেনিস থেকে আরম্ভ করে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিষটাই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।" ('ভারতচন্দ্র' শ্রাবণ ১৩৩৫)। প্রমথ-সাহিত্য তাই বীরবল-ভারতচন্দ্র-আনাতোল ফ্রাঁসের পথানুসারী।

বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই হাসির চর্চা প্রয়োজন, একথা প্রমথ চৌধুরী বলেছেন। আমাদের সমাজজীবনে ও রাষ্ট্রজীবনে যে দৈন্য ও ভিক্ষা-মনোবৃত্তি বিশ শতকের প্রথমার্ধে বারবার লক্ষ্য করা গিয়েছে, তার অবসান তিনি কামনা করেছেন। পরাধীন দরিদ্র অধঃপতিত বাঙালি জাতি জীবনে একটি অধিকার বুঝে নিয়েছে, তা হল কাঁদবার অধিকার। প্রমথ চৌধুরী এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমরা কাঁদতে পেলে যত খুশি থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকি নে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি।......কান্না ব্যাপারটাকে একটা কর্তব্যকর্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে।" ('খেয়াল-খাতা' বৈশাখ ১৩১২)। তার ফলে কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিতে, কি ব্যক্তিজীবনে তরলতা, অতিরোমান্টিকতা, ঘোলো ভাবোচ্ছ্বাস, খেলো বাগাড়ম্বর প্রাধান্য লাভ করেছে, সর্বত্রই ফোঁস-ফোঁস কান্না, নাকী সুরের কান্না এবং তাতেই আমরা বলিহারি যাই। জাতীয় চরিত্রের এই অধঃপতনে প্রমথ চৌধুরী

দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, এবং সে কারণেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বিলাপ না করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কড়া মন্তব্যের চাবুক মেরে তিনি বাঙালিকে বাস্তব-বর্তমান-যুক্তি-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

(অতিকান্নার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য প্রমথ চৌধুরী প্রস্তাব করেছেন: "করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক্ স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।" ('খেয়ালখাতা')। বাঙালি বীরবল তাই কান্নার বদলে হাসির, সস্তা তরল রোমাণ্টিকতার বদলে মননশীলতার চর্চা করতে চেয়েছেন এবং নির্ভয়ে ঘোষণা করেছেন, "আশা করি, যে হাসতে জানে না সেই যে সাধু পুরুষ ও যে হাসতে পারে সেই যে ইতর, এ হেন অদ্ভুত ধারণা এ দেশের লোকের মনে কখনো স্থান পাবে না। আমি লোকের মুখের হাসি কেড়ে নেওয়াটা নৃশংসতা মনে করি"। ('ভারতচন্দ্র')

'সনেট-পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থে এই মনোভাবের সমর্থক কয়েকটি সনেট পাই। প্রবন্ধে তাঁর যা বক্তব্য, সনেটে সেই একই বক্তব্য। এখানে মাত্র দুটি সনেট উদ্ধার করব। আমার বিশ্বাস, এর থেকেই বাঙালি বীরবলের সম্পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়বে।

'ভারতচন্দ্র' ও 'খেয়ালখাতা' প্রবন্ধের উপরি-ধৃত মন্তব্যনিচয়ে জীবনে কান্নার বিরুদ্ধে ও হাসির স্বপক্ষে 'বীরবল' যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, অবিকল তারই প্রতিধ্বনি শুনি 'হাসি ও কান্না' সনেটে:

> সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
> দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
> কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
> আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি।
> আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
> ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
> উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
> দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি।
> হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়,—
> সুখ তারা দেয় নাকো, তাই দুঃখ পায়।

তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,—
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ।

'ব্যর্থ জীবন' সনেটে বীরবল বলেছেন, 'পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।' এ-কথা এক শ' বার সত্য। 'আমি বাঙালি জাতির বিদূষক মাত্র': প্রমথ চৌধুরীর এই উক্তি বিনয়োক্তি। তিনি বাঙালি মনের মুক্তিদাতা। অন্ধ দেশাভিমান, জাত্যভিমান, মোহ ও বৃথা গর্ব থেকে তিনি বাঙালি-মনকে মুক্ত করে বিশ্বপথের মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের সমস্ত বাগাড়ম্বর ও অত্যুক্তি অগ্রাহ্য করে এই সংযতবাক্ যুক্তিধর্মী ব্যঙ্গপ্রবণ জীবনশিল্পী আমাদের জীবনকে, যৌবনকে, বস্তুরূপকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। সমস্ত তারল্য ও অতিরেক বর্জন করে যুক্তির আশ্রয়ে জীবনকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গভীর অনুরাগ ও বেদনা বহন করে এই জীবনরসিক, বাঙালিকে আত্মধিকার, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মদর্শনের আলোয় স্বপ্রতিষ্ঠ হতে বলেছেন; সেই বেদনাসিক্ত ব্যঙ্গরসিক জীবনশিল্পীর কণ্ঠে তীব্র ভর্ৎসনা শুনেছি 'বার্নার্ড শ' সনেটে:

সভ্যতার প্রিয়শত্রু, বার্নার্ড শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা হয় থ!
মানুষেতে ভালবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ প্রায়, যে করে বিচার,—
অন্যের পায়ের নীচে পড়ে যায় দ'
মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো,
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাসো॥
হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদঘর্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।

এই সনেট প্রমথ-চৌধুরীর যথার্থ আত্মপরিচয়। বাঙালির প্রিয়শত্রু বীরবল তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনায় যে জীবনধর্মে আমাদের দীক্ষা দিতে চেয়েছেন, তার পর্যালোচনা ও বাস্তব-রূপায়ণেই প্রমথ-সাহিত্য-চর্চার সার্থকতা নির্ভর করে।

২ | বীরবলের আত্মকথা

বহু বছর আগের কথা। গত শতকের শেষভাগে রবীন্দ্রনাথ তখন পদ্মালালিত মধ্যবঙ্গে নদীতে বোটে বাস করতেন। পদ্মা ও তার শাখানদীগুলির সঙ্গে সেদিন রবীন্দ্র-মানসের একটি অন্তরঙ্গ যোগ সাধিত হয়েছিল। সেই অন্তরঙ্গ ভালবাসার পরিচয় ছড়িয়ে আছে 'ছিন্নপত্রে'। ১১ই আগস্ট ১৮৯৩ তারিখে পতিসর থেকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাবক্ষে জীবন-যাপনের বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন—"অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে।…ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকায় অনেকগুলো ছোক্‌রা ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

যোবতী, ক্যান্‌ বা কর মন ভারী।
পাবনা থাক্যে আন্তে দেব ট্যাকা দামের মোটরি।"

পাবনা থেকে একটাকা মূল্যের মোটরি কিনে এনে দিলে যুবতীর মন হালকা হয়, এই আশ্বাসে কবি কৌতুক বোধ করেছিলেন, এবং লিখেছিলেন—"আমরাও ও-ভাবের ঢের (গান) লিখেছি, কিন্তু ইতরবিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা কিংবা নন্দন-কানন থেকে পারিজাতটা এনে দিতে প্রস্তুত হই; কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে, অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়।"

পাবনা থেকে মোটরি এনে দিলেই যুবতীকে খুশি করা যায়, এ-সংবাদ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে পাবনা থেকে আর একটি মূল্যবান রত্ন এসেছে, সেটি হল প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল। এজন্য আমরা পাবনার কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে। তাঁর নিজের

কথায়: "বাড়ি বলতে আমি সেই স্থানই বুঝি, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের পূর্বপুরুষদের বাস।" বীরবলের জন্ম যশোরে, কিন্তু যশোরের স্মৃতি অতি ক্ষীণ এবং যশোরকে কখনই তিনি আপন ব'লে স্বীকার করেন নি।

(প্রমথ চৌধুরীর বাল্যকাল কেটেছে কৃষ্ণনগর, পাবনা ও বিহারে, প্রথম যৌবন কৃষ্ণনগর ও কলকাতায়, মধ্য-যৌবন কলকাতা ও বিলেতে এবং শেষ জীবন শান্তিনিকেতনে। এর ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বনাগরিক, বৈদগ্ধ্য তাঁর প্রথম গুণ, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও বক্রকটাক্ষসমন্বিত দৃষ্টি তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বুদ্ধির মুক্তি তাঁর মুখ্য সাধনা।)

পিতৃপুরুষের বাসভূমি পাবনা জেলার হরিপুর ও পিতার কর্মস্থল নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর: এ দুই স্থানের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর জীবনে সবিশেষ বর্তমান। 'আত্মকথা'য় তিনি বলেছেন—"আমি ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরেই বাস করতুম সাড়ে এগারো মাস ও হরিপুরে পনেরো দিন। কিন্তু হরিপুর আমরা সঙ্গেই এনেছিলুম, তার মানসিক আবহাওয়াও।" হরিপুর গ্রামটি তাঁর খুব ভালো লাগত, এ কথা তিনি স্বীকার করেছেন। হরিপুর গ্রামটি চৌধুরীবংশের জমিদারী-ভুক্ত ছিল। হরিপুর গ্রাম ও কৃষ্ণনগর শহর—এ দুয়ের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর উপর পড়েছে।

চৌধুরীবংশের দুটি প্রভাব বাল্যেই তাঁর উপর মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল। এক—হাসির চর্চা, দুই—উদার জীবনসম্ভোগ। 'আত্মকথা'র প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে: "আমাদের পরিবারের পুরুষেরা ছিলেন সুপুরুষ, আর আমার খুড়ি-জেঠিরা সব ছিলেন গৌরবর্ণ। আর প্রায় সকলেই ছিলেন চালাক-চতুর। তাঁদের ছিল হাসিমুখ ও কথায় বার্তায় এঁরা হাসির চর্চা করতেন।" পুনশ্চ, "আমাদের পরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু; তার অর্থ এই যে হরিপুরের চৌধুরীরা সমাজের প্রচলিত প্রথা মেনে চলতেন, কিন্তু তাঁদের প্রকৃতিতে ভক্তির লেশমাত্র ছিল না।··· বৃদ্ধরা কাশী যেতেন দেহত্যাগ করতে, আর আমি আমার এক জেঠতুতো ভাইকে দেখেছি যিনি কিছু দিন কাশীতে গিয়েছিলেন, শিক্ষালাভ করতে। কিসের শিক্ষা জানিনে—কিন্তু শিখে এলেন শুধু তলোয়ার খেলা আর তীর ছোঁড়া।" চৌধুরীবংশে শিকারী ও গায়ক-বাদক দুই-ই ছিল।

গ্রাম ও শহর, শিকার ও গীতবাদ্য, জমিদারী ও মানসিক বৈদগ্ধ্য:

এই পরম্পরবিরোধী সংস্কারের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী মানুষ হয়েছিলেন, একথা স্মরণযোগ্য। বীরবলের গল্পে যেমন সিতিকণ্ঠ সিংহ ঠাকুরের মতো দুর্দান্ত শিকারী-বীণকার-জমিদার আছেন, তেমনি 'চার-ইয়ারি কথা'র প্রেমিক-বন্ধুরাও আছেন।

ফরিদপুর থেকে কৃষ্ণনগর, সেখান থেকে দ্বারভাঙ্গা, পুনর্বার কৃষ্ণনগর, তারপর মজঃফরপুর ভাগলপুর, সেখান থেকে আরা; তারপর কলকাতা, দার্জিলিং, রাজশাহী, পুনর্বার কৃষ্ণনগর, আবার কলকাতা, সেখান থেকে বিলেত: জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর এইভাবে যাযাবরের মতো প্রমথ চৌধুরী ঘুরে বেড়িয়েছেন। তার সুফল হয়েছে এই—তিনি ধর্মপ্রভাবমুক্ত উদার জীবনরসিক হতে পেরেছেন।

(প্রমথ চৌধুরীর গুরু কৃষ্ণনগরের রাজসভাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; শ'; ভোল্‌ত্যের, দোদে, আনাতোল ফ্রাঁস, মলেআর; ভাস ও রবীন্দ্রনাথ। তাই বলতে পারি প্রমথ চৌধুরী বাঙালি লেখক নন, আধুনিক জগতের লেখক)

॥ ২ ॥

এহেন বিশ্বনাগরিক প্রমথ চৌধুরীর আত্মজীবনী কী হতে পারে? তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনা এটাই প্রমাণ করেছে, তিনি যৌবনের ও তারুণ্যের, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের ও চঞ্চল ইয়োরোপের, প্রগতি-ভাবনা ও মননশীল চিন্তার প্রতিনিধি। তিনি একই সঙ্গে ভারতচন্দ্র ও ভাস, শ' ও রবীন্দ্রনাথ, আনাতোল ফ্রাঁস ও বীরবলের ভক্ত। তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রথম ও শেষ কথা—সংস্কারলেশহীন দৃঢ় ঋজু মনের চর্চা, তার পরিপাটি ঈষৎ বক্র বহিঃপ্রকাশ এবং কুজ্ঝটিকাশূন্য ভাবাবেগমুক্ত নির্মোহ বুদ্ধির জয়ঘোষণা। সুতরাং তাঁর যথার্থ আত্মজীবনী তাঁর সাহিত্য, তাঁর যোগ্য পরিচয় তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনামে—'বীরবল' উপাধিতে।

ব্যঙ্গের কশাঘাতে আমাদের মনকে নিদ্রারাজ্য থেকে উদ্ধার করে জাগ্রত করে তোলাই 'সবুজপত্র'র ও 'বীরবল'এর সাধনা, একথা তিনি বার বার বলেছেন। বস্তুত সেখানেই তাঁর সত্য পরিচয়। এখানে তাঁর সামাজিক কীর্তিকাহিনী (বিশেষ কিছু না) বা বংশগত কৌলীন্য (অধুনা তার কোন দাম নেই) অবান্তর। একমাত্র সনেটে প্রমথ চৌধুরী

নিজের সত্য পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সনেট-সুন্দরীর প্রেমে পড়ে তিনি মুহূর্তের জন্য ব্যঙ্গশিল্পীর নির্মোক খুলেছিলেন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে সেটি আবার পরিধান করেছেন।

তথাকথিত সামাজিক সাফল্যকে ব্যঙ্গ করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে॥
পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব॥
অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তব নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।

['ব্যর্থজীবন', সনেট-পঞ্চাশৎ]

আবার কখনো ব্যঙ্গভরে আত্মকথা লিখেছেন :

নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন।
কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই।

['আত্মকথা', তদেব]

আবার কখনো বা ক্রুদ্ধ হয়ে বার্নার্ড শ'-র কাছে আবেদন করেছেন :

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক।

['বার্নার্ড শ', তদেব]

আবার বন্ধুর কাছে মনের কথা বলেছেন :

তোমাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি।

জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।

['বন্ধুর প্রতি', পদচারণ]

তত্রাচ কখনো বা তিনি সত্যকথা গভীর সুরে বলেছেন :

জীবনের দিবসের স্বল্প পরিসর,
ঘিরে তারে আছে ঘন অনন্তের ছায়া।
যদিচ ধরেছি সবে দুদিনের কায়া,—
হাসির, কাজের, তবু আছে অবসর।

['হাসি', সনেট-পঞ্চাশৎ]

বলেছেন :

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা'-ইলাল্লা',
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুস্কিল-আশান'!

['মুস্কিল-আশান', তদেব]

পরমুহূর্তেই এই নির্বেদ কাটিয়ে উঠে বলেছেন :

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি॥
আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি॥ ..
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমত',
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙিন ফানুষ॥

['হাসি ও কান্না', তদেব]

বীরবলের সত্য পরিচয় এখানে বিধৃত হয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়ের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি এইটির উপর জোর দিয়েছেন—"কেবল কাব্যের গুণে প্রমোদের প্রভু"। ভারতচন্দ্রের স্বকৃত পরিচয়ের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে। বীরবল বলেছেন—'ঐ কথা শুনে আমরা দুটি জিনিসের পরিচয় পাই: রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করতে পারেনি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এই প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিন্‌কালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়। যে লোক ইউরোপে দ্বিতীয় শেকস্‌পীয়ার বলে গণ্য, সেই সেরভাণ্টেসের জীবন বিষম দুঃখময় ছিল, অথচ তাঁর হাসিতে সাহিত্যজগৎ চির-আলোকিত। এই হাসিকে ইউরোপীয়েরা বলেন বীরের হাসি। এ জাতীয় হাসির ভিতর যে বীরত্ব আছে তা অবশ্য পল্টনী বীরত্ব নয়, ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করবার ভিতর যে বীরত্ব আছে, তাই। এই হাসির মূলে কি আছে ভারতচন্দ্র নিজেই বলে দিয়েছেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—

চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেতচিত্ত সেই সদা দুখী॥'

['ভারতচন্দ্র', নানা কথা]

প্রমথ চৌধুরী তাঁর কর্মজীবনের ব্যর্থতা ও জীবনের চিরসঙ্গী রোগের আক্রমণ সত্ত্বেও যে 'প্রমোদের প্রভু' ছিলেন, তার কারণ তিনি ছিলেন চেতনামুখী, তাঁর চিত্ত ছিল সদানন্দে পূর্ণ, তিনি ছিলেন সদাসুখী। উজ্জ্বল চঞ্চল নির্মম বিদ্রূপের অনলে তাঁর চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সে-আলোয় বাঙালি জীবন ও সাহিত্যের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই তাঁর সত্য পরিচয়।

॥ ৩ ॥

তথাপি প্রমথ চৌধুরী আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন জীবনের অপরাহ্ণে। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে স্বেচ্ছানির্বাসিত। প্রতিভ-অনল

তখন প্রায় নিভে এসেছে। প্রৌঢ় অপরাহ্নের প্রশান্তি নেমেছে। কিন্তু বিদ্রূপের অনল ও ব্যঙ্গ-স্ফুলিঙ্গের দীপ্তি বর্তমান। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর ছয় বছর আগে, বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি 'আত্মকথা' লেখা শুরু করেন অল্পায়ু 'রূপ ও রীতি' পত্রিকায়। জন্ম থেকে বিলাতযাত্রা পর্যন্ত (১৮৬৮-১৮৯৩)—জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কাহিনী 'আত্মকথা' নামে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালের বিবরণ 'বৈশাখী' (১৩৫২) ও 'পূর্বাশা' (১৩৬০) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ এবং গ্রন্থভুক্ত হয়নি। (দ্রঃ—শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত গ্রন্থসূচী, প্রবন্ধ-সংগ্রহ ২।)

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন (৭ আগষ্ট) প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিন। 'আত্মকথা' লিখতে প্রমথ চৌধুরী শুরু করেন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু-বৎসরের পূর্ববছরে। ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিনে আত্মজীবনী রচনা চলেছে। এই সময়ে প্রমথনাথের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ, শাশুড়ী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। মৃত্যুর বিষণ্ণ ছায়া তখন তাঁকে ঘিরে আছে, তাঁর নিজের দিনও শেষ হয়ে আসছে, ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নস্বাস্থ্যে সে ইঙ্গিত তিনি পেয়েছেন। আশ্চর্য এই—'আত্মকথা'র কৈফিয়তে যে বিষণ্ণ বাতাবরণের পরিচয় রয়েছে, মূল কাহিনীতে তার ছায়াপাত হয়নি। 'হাসি ও কান্না' সনেটের কথা পুনর্বার মনে পড়ে—

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল।

দুঃখে তিনি মমতা করেননি, বিদ্রূপের হাসিতে তিনি দুঃখ-শোকের ঘনান্ধকার দূর করেছেন, বিশ্বকে রঙীন ফানুস জেনে তাকে ঠাট্টা করেছেন এবং ঠাট্টা করেই চিরবিদায় নিয়েছেন। কী মানসিক বল ও সবল প্রাণের অধিকারী হলে, এ কর্ম করা সম্ভব, তা শুধু অনুমেয়। এই আত্মকাহিনী পড়লে মনে হয় না যে, একজন চিররুগ্ন ভগ্নহৃদয় জীবনপ্রান্তে উপনীত প্রৌঢ়ের আত্মকথা। কৌতুকে হাসিতে বিদ্রূপে ব্যঙ্গে 'আত্মকথা' উজ্জ্বল। প্রভাতের অজস্র আলোকধারা ও মধ্যাহ্নের খররৌদ্র, উভয়ই এখানে বর্তমান। সেই-যে সাহিত্য-জীবনের গোড়ায় তিনি বলেছিলেন—"করুণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া

নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই দুর্দিনে হাসি কি শোভা পায়। তার উত্তর, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও কি বিদ্যুৎ দেখা দেয় না কিংবা শোভা পায় না। আমাদের এই অবিরতধারা অশ্রুবৃষ্টির মধ্যে কেহ-কেহ যদি বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।" ('খেয়ালখাতা' : ১৯০৫)। পঁয়ত্রিশ বছর পরে জীবন সায়াহ্নে সেই প্রতিজ্ঞা প্রমথ চৌধুরী অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তার প্রমাণ 'আত্মকথা'।

এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থ মামুলি আত্মজীবনী নয়। এতে কেবল সাহিত্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যজীবনের, তাঁর মনের ও ভাষার ভিত্তিনির্মাণের ইতিহাস মাত্র নেই, এতে দুনিয়াদারীর পরিচয় আছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর যে কত গভীর অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তার পরিচয় এখানে পাই। 'আত্মকথা'র ভূমিকা-লেখক শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বলেছেন—"প্রথম বয়স থেকেই প্রমথবাবু মিশেছেন সকল শ্রেণীর নানা লোকের সঙ্গে। আমরা অনেক সময় রহস্য করে বলেছি যে ছয় কোটি বাঙালির মধ্যে প্রমথবাবু চার কোটি লোককে চেনেন। এবং যার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয় তার শরীর ও মনের চেহারা ও ভাবভঙ্গী তাঁর মনে গেঁথে যায়। আর মনে করলেই তার শব্দচিত্র অসাধারণ কৌশলে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এর পরিচয় তাঁর ছোটগল্পে ছড়ান রয়েছে। এই আত্মকথা সাহিত্য হিসাবে তাঁর ছোটগল্পের মতই তীক্ষ্ণ ও সরস।"

গল্পের আকর্ষণ সাহিত্যের প্রবলতম আকর্ষণ। সেই আকর্ষণে এবং স্বাদু উপভোগ্য কথনভঙ্গীতে এই 'আত্মকথা' জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যৎসামান্য উদাহরণেই তা বোঝা যাবে। কৃষ্ণনগরে কৈশোরে প্রমথ চৌধুরী ব্রজবাবুর ইস্কুলে পড়তেন। সেখানকার নানা চমকপ্রদ রসাল বিবরণ 'আত্মকথা'য় আছে। চৌধুরীমহাশয় বলেছেন—"লাস্ট ক্লাসের গিরিশ পণ্ডিত আমাদের নীতি উপদেশ দিতেন। তাঁর একটি উপদেশ আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, মাছমাংস কখনো খেয়ো না, যেমন আমি খাই নে। তবে মাছের ও মাংসের ঝোল খেয়ো যেমন আমি খাই; আর ঝোলের সঙ্গে যদি দু-এক টুকরো মাছ

কি মাংস আসে, তা খেতে পারো। যো আপসে আতা উসকো আনে দেও—এই বলে।"

এই ধরনের নানা বিচিত্র কাহিনীর রসাল বর্ণনায় 'আত্মকথা' পরিপূর্ণ। কেবল কৃষ্ণনগরে নয়, কলকাতা, বেহার, লণ্ডন—সর্বত্রই লেখকের এই সহজ প্রসন্ন রসিকতা বর্তমান।

কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণের কথা স্বীকার করেছেন প্রমথ চৌধুরী। বলেছেন—"আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।" ব্রাত্যজীবনে, গানে মশকরায়, আলাপচারিতায় কেচ্ছায় ভাষার প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। জীবনে ও সাহিত্যে যে উদারতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তার মূলে আছে কৃষ্ণনগরের জীবনযাত্রা। তাঁর ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাগরিকরা পঞ্জিকাশাসিত ছিলেন না, তাঁদের ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। এই ধর্মগোঁড়ামিমুক্ত উদার জীবনবোধ বীরবলী সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। "যার মুখের ভাষা ভাল সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিকরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী।... এজন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।...সেকালে যারা ছোক্‌রা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দুজনেরই লেখায় আর গুণের অভাব থাক—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়।"

কৃষ্ণনগরের জীবনে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না, এটা প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে সুফলদায়ী হয়েছিল। জীবনের সর্বস্তর থেকে আনন্দ-আহরণের দুর্লভ ক্ষমতা তাঁর ছিল। সে-পরিচয় 'আত্মকথা'য় রয়েছে। নেড়ানেড়ীর গজল হোক বা মার্গসংগীত-ই হোক—সর্বত্রই তিনি আনন্দ পেতেন। ঐ গজলের একটু পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

নেড়ার উক্তি: যদি গৌর চাস্ কাঁথা নে ধনী।
সকালবেলা ভিক্ষেয় যাবি
ঘরে এসে তেল মাখাবি,
আর পেতে দিবি বিছানাখানি।

আর গাঁজার কল্‌কেয় আগুন দিবি দিবস রজনী।

নেড়ীর উক্তি : এ-পূজোতে ঝুমকো দিবি, তবে ঘরে রইব।

…ইত্যাদি।

এ-সব গীতে রুচির উৎকর্ষ বা সংগীতের মাহাত্ম্য কিছুই নেই, এগুলি উপভোগ করার ক্ষমতা যে প্রমথনাথের ছিল, তার থেকে প্রমাণ হয় তিনি ছিলেন জীবন-রসিক। এইটি ফরাসী জীবনের বিশিষ্ট লক্ষণ। শ্লীল-অশ্লীলের শুচিবায়ু ফরাসীদের মতো বীরবলের ছিল না, ছিল জীবনের প্রতি বিপুল আগ্রহ।

ছেলেবেলায় কৃষ্ণনগরের সেতারের বোল—'বৌ-কথা-কও পাখী ছিল ডালেতে বসে, তাদের মারলি কি দোষে!' এ যেমন তিনি উপভোগ করেছেন, তেমনি তাঁর প্রথম যৌবনে বর্তমান শতকের গোড়ায় কলকাতার জনপ্রিয় সংগীত 'আয় লো অলি কুসুম তুলি' আর 'যমুনা-পুলিনে বসি কাঁদে রাধা বিনোদিনী' সমান উপভোগ করেছেন। তখনো রবীন্দ্রনাথের গান প্রচলিত হয়নি। ভাবলে আশ্চর্য লাগে, যিনি সাহিত্যের সাত সাগরের নাবিক, রবীন্দ্র-সাহিত্যের যোদ্ধা, সংস্কৃতির শিখরে শিখরে যাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার, তিনি কিভাবে এইসব সাধারণ রুচির গান উপভোগ করতেন! জীবনকে গ্রহণ করবার যে বিপুল আগ্রহ ও প্রচণ্ড শক্তি প্রমথ চৌধুরীর ছিল, তাই তাঁকে একাধারে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও জনসাধারণের বয়স্য করে তুলেছে। ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের প্রতি ও মার্গসংগীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে, সে-কথা এখানে তিনি কবুল করেছেন।

নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরী অবলীলাক্রমে মিশতে পারতেন, তার প্রমাণ 'আত্মকথা'য় পাই। উপরিউক্ত গীতগুলির রসোপভোগে তাঁর দিক থেকে কোনো বাধা ছিল না। প্রমথ চৌধুরীর প্রথম সাহিত্যরচনা : দুটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ ও 'জয়দেব' প্রবন্ধ। ফরাসী লেখক মেরিমে-র 'ফুলদানি' ও 'কার্মেন' তর্জমা তিনি করেছিলেন। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয়টি অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—" 'কার্মেন' অনুবাদ করার কারণ, তার বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চাইতে ঢের বেশি অসামাজিক। সাহিত্যিক শুচিবাই প্রথম থেকেই আমার ধাতে ছিল না। এবং প্যুরিটানিজম্‌কে আমি

কোনকালেই একটা গুণের মধ্যে গণ্য করিনি। তার পরিচয় আমার 'জয়দেব' নামক প্রবন্ধেও পাবেন।"

সহাস্য রসিকতা ও শুচিবায়ুমুক্ত জীবন-সম্ভোগ বীরবল-সাহিত্যের মূলে আছে। এখানে তারই স্বীকৃতি। নিজেকে নিয়েও তিনি এমন সব রসিকতা করেছেন যা সব সময় তথাকথিত ভদ্রতার গণ্ডী রক্ষা করে চলেনি। দুটি মাত্র উদাহরণ এখানে উদ্ধার করছি। দুটিই রবীন্দ্র-সম্পর্কিত; প্রথমটিতে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়; দ্বিতীয়টিতে ব্যক্তি-রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শনলাভের সুযোগ—যা তিনি হেলায় ত্যাগ করেন।

প্রথম বিবরণ:

"হেয়ার ইস্কুলে আমি ক্রমে আবিষ্কার করি যে, অনেকের কাছে আমি 'ললিতা' বলে পরিচিত ছিলুম। আমি একটি ছোক্‌রাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি এ নামের অর্থ কি?—সে বলে, 'তুমি রবীন্দ্রনাথের "ভগ্নহৃদয়" পড় নি?' আমি বলি, 'না'। সে বলে, 'একখানি "ভগ্নহৃদয" কিনে পড, তাহলেই জানতে পারবে যে, ললিতার সঙ্গে তোমার কি মিল আছে।' তার কথায় আমি 'ভগ্নহৃদয' কিনে পড়ি। রবীন্দ্রনাথের পুস্তকের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আমি 'ভগ্নহৃদয' পড়ে মুগ্ধ হই নি, এবং ললিতার সঙ্গে আমার মিল কোথায়, তাও বুঝতে পারি নি। 'ভগ্নহৃদয়'-এ দুই-চারিটি প্রাকৃতিক বর্ণনা আমার খুব ভাল লাগে।"

দ্বিতীয় বিবরণ:

"আমি কলকাতায় পঠদ্দশায় দুটি ব্যক্তির দর্শনলাভের সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করি নি। সেই দুজনই ভবিষ্যতে আমার জীবন ও মন অধিকার করেন। একজন হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী। বোধহয় ১৮৮৪ খৃঃ সরস্বতী পুজোর দিন, হঠাৎ গরম পড়ায় আমি হুজুরিমল ট্যাঙ্ক লেন থেকে হেঁটে প্রেসিডেন্সি কলেজের দক্ষিণের মাঠে উপস্থিত হই। এসে দেখি আমার বন্ধু নারায়ণপ্রসাদ শীল সেখানে একটি গাছতলায় শুয়ে আছেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে অ্যাল্‌বার্ট হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি একটা বক্তৃতা করছেন, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর একটি বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। আর বল্লেন, 'চল না, রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা অ্যাল্‌বার্ট

হলে যাই।' আমি তাঁর এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলুম না, কারণ আমি শ্রান্ত বোধ করছিলুম। নারায়ণ বল্লেন, 'রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা না শুনতে চাও, অন্তত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখে আসি চল। শুনেছি মেয়েটি নাকি অতি সুন্দরী।' আমি উত্তর করলুম, 'পরের বাড়ীর খুকি দেখবার লোভ আমার নেই।' ফলে আল্‌বার্ট হলে না গিয়ে নারায়ণ আর আমি সেই গাছতলাতেই শুয়ে থাকলুম। পরে সে মেয়েটিকেই আমি বিবাহ করি।"

এই গল্প দুটি যদি সত্য হয়, তবে বীরবলী রসিকতা কী বস্তু তা কেবল অনুমেয়; আর যদি নিছক গল্প হয় তাহলে খাসা গল্প, এ-কথা অবশ্যস্বীকার্য। কেবল বাংলাদেশ ও সমাজকে নিয়ে নয়, নিজেকে উপলক্ষ করে রসিকতা করার বিরল ক্ষমতা বীরবলের ছিল, এ তারই পরিচয়স্থল।

॥ ৪ ॥

'আত্মকথা' পড়লে টের পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরী রূপলোকের অধিবাসী ছিলেন। তিনি যে রূপের উপাসক ছিলেন, সে পরিচয় তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে ছড়িয়ে আছে। তিনি বাঙালিকে কেবল বুদ্ধি ও যুক্তির পথে চালনা করেছেন, তা নয়; তাকে সুন্দরের, রূপের, ইন্দ্রিয়-উপভোগের পথে চালাতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের রংছুট গান-ছুট ধূসর জীবনে সবুজ রং অর্থাৎ নবীন যৌবনের রং লাগাতে চেয়েছিলেন, আমাদের বৈরাগ্য-তামসিকতাকে নির্মম ব্যঙ্গ করেছিলেন। ইন্দ্রিয়-উপভোগের যে প্রত্যক্ষ জগৎ সে-জগতেই প্রমথ চৌধুরীর মানসবিহার; রূপলোক তাঁর প্রার্থিত স্বর্গ।

এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য স্মরণযোগ্য: "ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।

"রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাক্‌টেড হয়ে আসে তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে

রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।...

"যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করতে বাধ্য—তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে, কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়।...

"আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারিনে তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়ঃ। তাতে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমনকি আমাদেরও নয়।" ['রূপের কথা' ফাল্গুন ১৩২৩ বীরবলের হালখাতা।]

'আত্মকথা' রূপলোকের অধিবাসীর রচনা। এতে তীক্ষ্ণতা, সহাস্য রসিকতা ও ভূয়োদর্শিতার সঙ্গে মিলেছে প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য, সূক্ষ্ম মননশীলতা ও নির্মেঘ সূর্যকরের মতো বুদ্ধির আলোক।

'আত্মকথা'র কৈফিয়তে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—"নিজের জীবনে অতীত বলে কিছু নেই। যা আছে, তা একটি প্রকাণ্ড বর্তমান। যদিচ বর্তমান বলে একটি মুহূর্তও নেই। যাকে আমরা বলি বর্তমান, সে হচ্ছে অতীত এবং ভবিষ্যতের কাল্পনিক সন্ধিক্ষণ মাত্র।"

প্রমথ চৌধুরী যৌবনের ও বর্তমানের পূজারী। বর্তমানের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতি অন্যত্রও আছে। তিনি বলেছেন—"আমাদের ভবিষ্যৎও নেই অতীতও নেই। এক বাকি থাকল বর্তমান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুশকিলের কথা। বই পড়ে বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখেশুনে লেখা আর। একাজ করতে হলে চোখ-কান খুলে রাখতে হবে, মনকে খাটাতে হবে; এককথায় সচেতন হতে হবে। তারপর এত কষ্ট স্বীকার করে যে সাহিত্য গড়তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য করবেন না। মানুষে বর্তমানকেই সবচাইতে অগ্রাহ্য করে। যাঁদের চোখকান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নবসাহিত্যকে নবীন বলে নিন্দা করবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্তমানের কোনো ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন হতে বঙ্গসরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।" ['প্রত্নতত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস' আষাঢ় ১৩২৩, বীরবলের হালখাতা।]

শুচিবায়ুমুক্ত জীবন-সম্ভোগেচ্ছা ও অতীতের পিছুটানমুক্ত বর্তমানের উপাসনা, নবীন যৌবনের প্রতিষ্ঠা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আরাধনা—প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-সাধনার মূল কথা। 'আত্মকথা'য় তার শেষ পরিচয় জীবনের প্রদোষে প্রমথ চৌধুরী রেখে গেলেন। অথচ 'আত্মকথা'র আকাশ প্রভাতের আকাশ, সেখানে সহাস্য রসিকতার প্রসন্ন কিরণধারা ঝরে পড়েছে, মোহমুক্ত বুদ্ধির জয় ঘোষিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিন। আর প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুদিন (২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) ?—সেদিন কেউ তাঁর সঙ্গী নয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি যে-পথে যাত্রা করেছিলেন, তা অপরিচিত নোতুন পথ। তাঁর জীবৎকালে কয়েকজন সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা নগণ্য। আজো সে-পথ বিরলপথিক। প্রমথ চৌধুরীর যথার্থ বোদ্ধা পাঠকসমাজের পরিধি আজো খুব বিস্তৃত নয়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই পরিধির বিস্তার হবে ও অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা বাড়তে থাকবে, এই আশ্বাস বর্তমান আলোচনার প্রেরণাস্থল।

৩ | সবুজপত্র ও বাংলা সাহিত্যে মোহমুক্তি

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে সবুজপত্রের প্রকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন পর্বের সূচনা হল। সে পর্ব কেবল চলতি গদ্যের বিজয়াভিযান পর্ব নয়, তা সাহিত্যে মোহমুক্তিরও পর্ব। প্রমথ চৌধুরী যে বাংলা গদ্যের চর্চা করলেন সবুজপত্রের পাতায়, তা পুরোপুরি মুখের ভাষা নয়, স্ল্যাঙ্ বা আটপৌরে ভাষাও নয়, তা কতকটা চলতি, তবু শিষ্ট, সংযত বাচনভঙ্গী।

বাংলা সাহিত্যে সবুজপত্রে প্রবন্ধের ফসল ফলেছে। সে তুলনায় কবিতা গল্পের ফসল পরিমাণে কম। আমাদের সাহিত্য-দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমথ চৌধুরী বদলে দিতে চেয়েছিলেন। এবং একটি শক্তিমান প্রবন্ধকার গোষ্ঠী তৈরী করে সে কাজে সাফল্যও লাভ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী একটি বিদগ্ধ নাগরিক রুচিবান পরিপাটি মনের অধিকারী ছিলেন। সবুজপত্রের সকল লেখাতেই এই পারিপাট্য ও নাগরিকতার ছাপ পড়েছে। সবুজপত্রের প্রবন্ধাবলীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, এই বিদগ্ধ রুচিবান নাগরিক মানস সৃষ্টিতে। এই মানস বিদেশী সাহিত্যক্ষেত্র থেকে প্রচুর শস্য আহরণ করেছে, বাঙ্গালী তথা ভারতীয় চরিত্র ত্যাগ করে ধীরে ধীরে বৈশ্বিকতা লাভ করেছে, নিছক কল্যাণবুদ্ধি ত্যাগ করে নির্মোহ বিশুদ্ধ চিন্তার পোষকতা করেছে। ফলে এই মানসিকতা কতকটা উন্নাসিক হয়েছে, এই কথা অনস্বীকার্য।

প্রমথ চৌধুরী যে কটি গুণের চর্চায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলেন। তা হল যুক্তিবিচারে শ্রদ্ধাশীলতা, প্রসাদগুণ (ক্ল্যারিটি) ও দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা (স্যানিটি), মার্জিত রসিকতা ও নিবিড় ঐহিকতা, সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও পরিশীলিত সংস্কৃতিবোধ।

এই কটি গুণের প্রকাশ কেবল চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধতেই দেখা গিয়েছে তা নয়, সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অন্যান্য লেখকের প্রবন্ধতেও লক্ষ্য করা যায়। অব্যবহিত পূর্ববর্তী পর্বের প্রবন্ধকারবৃন্দের (যেমন রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী, সুরেশ সমাজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র পাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) লেখায় যে মানসিকতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, তা সবুজপত্র পর্বের মানসিকতা থেকে ভিন্নতর। পূর্বোক্ত দলের লক্ষ্য দেশ-কাল-সমাজ, শেষোক্ত দলের লক্ষ্য বিশ্বনাগরিকতা বৈদগ্ধ্যমার্জিত বুদ্ধির উদ্বোধন। পূর্বোক্তের দৃষ্টিভঙ্গী কল্যাণমুখী, শেষোক্তের আগ্রহ রুচির পরিশীলন ও মার্জনায়।

তাই সবুজপত্রের মানসিকতা দেশজ মানসিকতা নয়, একথা বলা যেতে পারে। সবুজপত্রের প্রবন্ধাবলী প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বাঙালি পাঠককে মুক্তি দিয়েছিল। সে মুক্তি কিসের মুক্তি? রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতার অন্ধ গুহা থেকে মুক্তি, জাত্যভিমান ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা থেকে মুক্তি, ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্তি। স্বতন্ত্র ঋজু নির্মোহ চিন্তার খর সূর্যালোকে বাংলা প্রবন্ধ রাজ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এই সামান্য লক্ষণ-গুলি সবুজপত্র গোষ্ঠীর সকল লেখকের রচনাতেই উপস্থিত।

সবুজপত্রের পরিচয় কেবল তার সংগ্রামী চরিত্রে নয়, তার সুরের ঐক্যে, সবুজপত্রীদের সমধর্মিতায়। এর ফলে সবুজপত্র স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন "বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে" রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি মণিলালকে বলেছিলেন "তুমি যে কাগজ বের করবে, তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তার চেয়েও বড়ো কথা। দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে দাবী থাকবে, সে চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ করে সাবধান করে; লেখার অপরিচ্ছন্নতা শৈথিল্য চিন্তার দৈন্য আপনিই সঙ্কুচিত হয়। অন্তত: আপন উত্তরীয়টিকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তার তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি করে তুলবে।"

সবুজপত্রের এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ছিল। পত্র সম্পাদনায় এই তপস্যা ও সৃষ্টির যাথার্থ্য লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং সে কথা বার বার স্মরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী-সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ (১৯৪১)-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ পুনরায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

"আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি।"

প্রমথ চৌধুরীর ভাষাতেই এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভাবালুতা, অস্পষ্টতা, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি, বিশৃঙ্খল-পদান্বয়, অকারণ বিশেষণ বাহুল্য, অনুরূপ ক্রিয়াপদের একঘেয়েমি—বাংলা গদ্যের এই সব দুর্লক্ষণ প্রমথনাথ তাঁর রচনায় সমূলে উচ্ছেদ করেছেন। এর পেছনে একটি পরিশীলিত নাগরিক সহাস্য বিদগ্ধ মনের অস্তিত্ব অনুভব করি। বাংলা গদ্যের যে একটি পরিমিত, সুসভ্য, সংগত ব্যঙ্গনিপুণ, তীক্ষ্ণাগ্র উজ্জ্বল চেহারা বীরবলী গদ্যে দেখি, তা আসলে ঐ মনেরই বহিঃপ্রকাশ।

এবং এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগত নয়, তা গোষ্ঠীগত, সবুজপত্রীদের সকল লেখাতেই এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। ভাবালুতা ও সংস্কারমোহের বিরুদ্ধে লড়াই, নির্মোহ বুদ্ধি ও যুক্তির উপাসনা, বিশ্ব-সংস্কৃতির আনন্দ-যজ্ঞে অংশ গ্রহণ ও তারই আলোয় নিজ সাহিত্য-সংস্কারের পরিমার্জনা—এ সবই সবুজপত্রীদের লেখায় নির্ভুল ভাবে উপস্থিত।

সবুজপত্র কি ধরণের পত্রিকা হবে, কি রকমের লেখা ছাপা হবে, লেখকের ও পাঠকের কাছে তার প্রত্যাশা কী হবে, এ নিয়ে প্রথম সংখ্যাতেই (বৈশাখ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ) প্রমথ চৌধুরী আলোচনা করেছেন। এই বক্তব্যই সবুজপত্রের সকল রচনার মূল সুর। তাতে চৌধুরী মহাশয় বলেছেন "সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরুক করে তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্রমণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তা হলে আমরা বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর করতে পারব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে

কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক উপলব্ধি করতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে, জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে, আলস্যকে ঔদাস্য বলে, শ্মশানবৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে, উপবাসকে উৎসব বলে, নিষ্কর্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল। যে দুর্বল, সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না—কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করতে পারে।" এই নির্মম বাক্য-চাবুক মেরে বাঙ্গালী পাঠক মনকে জাগিয়ে তোলার সার্থক স্পর্ধা করেন প্রমথ চৌধুরী।

এখানেই শেষ নয়। বাংলা সাহিত্য আর দেশজ থাকবে না, তা হবে দেশোত্তর, সে কথাও এই ভূমিকায় বীরবল বলেছিলেন। কেবল দেশীয় প্রেরণাই যথেষ্ট নয়, চাই বিদেশী দক্ষিণা-পবন,—"ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিত মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব-সাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরা মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটেছে। তার ফল কি হবে, সে কথা না বলতে পারলেও এই ফুল ফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন, তাকেই আমরা ফুলের চাষ করবার জন্য উৎসাহ দেব।"

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রাণের যে লীলা দেখা গেছে, বীরবল তাকেই বাংলা সাহিত্যে আনতে চেয়েছিলেন। জাড্যলেশহীন তারুণ্যের সাধনাই যথার্থ সাহিত্য-সাধনা বলে ভেবেছিলেন। "এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারে তবেই

তা পরে সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে, আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।...ইংরাজী শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে। নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না।''

সবুজপত্রে এই তারুণ্যের সাধনা প্রাণের জয়ঘোষণা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও প্রতারণার বিরুদ্ধে লড়াই ; মানসিক ঔদার্য ও আত্মসংযমের সাধনা ; দেশ নয়, দেশোত্তর প্রেরণার আহ্বান, সংহত পরিপাটি রচনার প্রযত্ন ও যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ দৃষ্টির প্রসার লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেবল গোষ্ঠীপতির লেখায় নয়, গোষ্ঠীর ছোট-বড় সকলের রচনাতেই এই যুক্তি ও মোহমুক্তি, সংযম ও শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়, এখানেই সবুজপত্রের সার্থকতা।

৪ | বীরবলী গল্প

ইংরেজী উপন্যাসের প্রবর্তক ফীলডিং দম্ভভরে বলেছিলেন, "গল্প-উপন্যাসের রাজ্যে সমালোচকের কোনো শাসন চলবে না। এ-রাজ্যে আমি যা বলব, তাই হবে।" ফীলডিং-এর এই দম্ভ যতটা অন্যায় শোনায় আসলে ততটা অন্যায় নয়। গল্প-উপন্যাস সত্যই কোনো সাহিত্য-অনুশাসন মেনে চলে না। গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু হয় না এমন কিছু ভূ-ভারতে নেই। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শাস্ত্র, যৌনসমস্যা, রাজনীতি, দেশপ্রেম, ব্যক্তিক রাগ-অনুরাগ, মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম, সব কিছুই এই রাজ্যের এক্তিয়ারে পড়ে। এব থেকে মনে হয়, ফীলডিং-এর দম্ভ ও দাবি অনুচিত নয়।

বাংলা সাহিত্যের শীতরিক্ত কুঞ্জে যখন ইউরোপের দক্ষিণ-পবন এসে পৌঁছল, তখন আবার ভাঙা ডাল সতেজ হল, নতুন করে কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল। সুন্দরের আগমনে যেমন হীরা মালিনীর কুঞ্জে ফুল ফুটেছিল, ইউরোপীয় ভাবধারার আগমনে তেমনি বাংলা সাহিত্যের কুঞ্জে নোতুন ফুল ফুটল। বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের এই ব্যাখ্যা আমার একার নয়, নিতান্ত অন্ধ দেশভক্ত বাদে বাকি সবাই এই সত্য স্বীকার করবেন। সবুজপত্রের অধিনায়ক প্রমথ চৌধুরী এই কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতেন।

প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় কেবল বিদূষণে—পরের মনোরঞ্জনে নয়, পাঠকের খোসামুদিতে নয়, প্রয়োজনমতো বাঙালি পাঠককে অপ্রিয় কড়া কথাও তিনি শুনিয়েছেন। তার প্রমাণ "বীরবলের হালখাতা (১৯১৭), "নানা কথা" (১৯১৯), "বীরবলের টিপ্পনি" (১৯২১)। তাঁর ছদ্মনাম বীরবল সার্থক নাম, কেননা রাজা বীরবলের মত বুদ্ধি ও সাহস, উইট ও হিউমর, আর্ট ও নলেজ—তাঁর করায়ত্ত ছিল। ফল কথা, তিনি বাগে পেলে কাউকে ছাড়তেন না, এবং রেখে-ঢেকে বলতেন না। সুতরাং এ-হেন ব্যক্তি যে তাঁর বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চাতেও এই স্বভাবের পরিচয় রেখে

যাবেন, তা আর বিচিত্র কি! কবিতা ও গল্প রচনাতে প্রমথ চৌধুরীর সেই দক্ষতাই ছিল যে-দক্ষতার পরিচয় রয়েছে উপরোক্ত প্রবন্ধাবলীতে। বস্তুত ফরাসীসুলভ বিদগ্ধ অনুশীলিত মনের অধিকারী প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যকে অনেক জঞ্জালের কবল থেকে রক্ষা করেছেন তাঁর অপ্রিয় সত্যভাষণের দ্বারা, নির্মম সম্মার্জনী চালনার দ্বারা, সবল অধিনায়কতার দ্বারা। সুতরাং ফীলডিং-এর মত দম্ভোক্তি করার অধিকার ও ক্ষমতা প্রমথ চৌধুরীর ছিল, এ-কথা অনস্বীকার্য। আর তিনি তা করেওছিলেন, তার প্রমাণ "পদচারণ" কবিতা-সংকলনের উপহার-পৃষ্ঠা। তাতে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে এই সংকলন উপহার দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক্, আছে —rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason।"

প্রমথ চৌধুরী যে শাণিত কলমে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেই কলমেই গল্প-কবিতা লিখেছিলেন। তাই দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ত্রই এক। তিনি যে আপন পথ থেকে কখনও ভ্রষ্ট হননি, তার যথেষ্ট প্রমাণ সবুজপত্রের পাতায় ছড়ান রয়েছে। গল্পের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী স্বতন্ত্র রুচির পরিচয় দেবেন, এ-কথা স্বতঃসিদ্ধ। সমালোচকদের ভ্রূভঙ্গিতে তিনি যে ফীলডিং-এর মতই ভয় পাননি, তার প্রমাণ এই ক'টি চরণঃ

সমালোচকের প্রতি

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে!
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

পুনশ্চ, 'বার্নার্ড শ' সনেটে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেনঃ

এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক!

আবার, 'ব্যর্থ জীবন' সনেটে শ্লেষ-ভরা কণ্ঠে বলেছেন :

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব॥

এই শেষ চরণটি প্রমথ চৌধুরীর খাঁটি সত্য কথা : 'পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।' সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর গল্পে বাঙালি পাঠকের সাধারণ প্রত্যাশা তৃপ্ত হবে না, বরং বিপরীতটাই ঘটবে। তাঁর গল্পে দুটি জিনিস নেই—যা সাধারণ বাংলা গল্পে ভূরি ভূরি আছে—জ্যাঠামি ও ন্যাকামি। তত্ত্ব-উপদেশ দানে এবং আদর্শ প্রেমের অবাস্তব প্রতিমা-চিত্রণে চৌধুরী মশায়ের সমান অনীহা। 'বন্ধুর প্রতি' সনেটে তিনি এ-কথাই বলছেন :

লোকে বলে আছে তব কিঞ্চিৎ ক্ষ্যাপামি
তথাপি আমার তুমি চির-প্রিয়পাত্র।
তোমাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি. শিখিনি ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জ্বলে যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।
নীতি আর রাজনীতি আর ধর্মনীতি,
যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।
প্রিয় শিষ্য কারো নই তুমি আর আমি,
আমাদের রোগ খোঁজা গুরুবাক্যে মানে,—
অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে জানে,
যা কিছু বোকামি নয় তাহাই ক্ষ্যাপামি।

এই অভিমতের প্রতিধ্বনি শুনি 'সাহিত্যে খেলা' (শ্রাবণ ১৩২২) প্রবন্ধে। "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়।...কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়,—কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।"

সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর গল্পে গুরুগম্ভীর সনাতনী উপদেশ খুঁজতে গেলে

অমরা ব্যর্থ হব, সামাজিক উপকার বা অন্যায়ের প্রতিকারের হদিশ সেখানে পাব না। খেলাচ্ছলে শিক্ষা বা গল্পচ্ছলে উপদেশ দানের মহৎ ব্রত প্রমথ চৌধুরীর ছিল না। সুতরাং নীতিবাগীশ বা ব্যবসায়ী (অর্থাৎ যিনি গল্প পড়ে কিছু লাভ খোঁজেন) পাঠক প্রমথ চৌধুরীর গল্প পড়বেন না, এটাই লেখক চেয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের এইটুকু ভূমিকা।*

॥ ২ ॥

অথ কথারম্ভ। প্রমথ চৌধুরী অজস্রপ্রসূ লেখক ছিলেন না, তিনি বাংলা সাহিত্যে দিয়েছেন ধূলিমুষ্টি—কিন্তু তা স্বর্ণমুষ্টি। গল্পও তিনি খুব বেশি লেখেন নি। যা লিখেছেন, তা আঙুল গুনে বলে দেওয়া যায়।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় 'চার-ইয়ারী কথা'র (১৯১৬)। এটি একটি গল্প নয়, চারটি গল্পের সমষ্টি। একদা আসন্ন ঝড়বৃষ্টির মুখে স্তব্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে ক্লাবঘরে বসে হাতে মদের গেলাস নিয়ে চার বন্ধু আপন আপন প্রেমের অভিজ্ঞতা বিবৃত করেছিলেন। ক্লাবঘরের সেই পটভূমিকায় চার বন্ধু কথকতা করেছিলেন। গল্পগুলির বাহ্যত সাদৃশ্য এই পর্যন্তই। কিন্তু আন্তরসাদৃশ্য আরও গভীরে। প্রেমের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদের যে সনাতন ধারণা আছে, তা লেখক বিপর্যস্ত করে দিয়েছেন এইসব অভিজ্ঞতার দ্বারা।

প্রথম গল্প—সেনের কথা। এক পূর্ণিমার রাত্রে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে একটি পূর্ণযৌবনা অপূর্বসুন্দরী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে সেনের সাক্ষাৎ হয়। সেদিন জ্যোৎস্না কলকাতায় অপূর্ব মোহ বিস্তার করেছিল। সেই আলোর বন্যায় মেয়েটিকে দেখামাত্র সেন প্রেমে পড়ে গেলেন, মেয়েটি সম্মতি জানিয়ে হাসল। তারপরই মোহভঙ্গ। মিনিট কয়েকের মধ্যেই প্রকাশ পেল মেয়েটি পাগল, পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে এসেছিল। রক্ষকেরা এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সেই উন্মাদিনীর অট্টহাসি ও কান্না সেনের সমস্ত স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিল। সেনের কথা,—"সেদিন

* সম্প্রতি প্রমথ চৌধুরীর গল্পসংগ্রহ পরিবর্ধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত প্রথম প্রকাশ ২০ ভাদ্র ১৩৪৮। ১৯৪১) হয়েছে।

থেকে চিরকালের জন্য ইটার্নাল ফেমিনাইনকে হারিয়েছি। কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।"

দ্বিতীয় গল্প—সীতেশের কথা। তিনি "অনেকের ভিতরে ইটার্নাল ফেমিনাইনকে" পেতে চেয়েছিলেন। ফল হয়েছে, সেনের মত তিনিও তা পাননি। একদা লণ্ডনে বর্ষার সন্ধ্যায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সীতেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, একটি পুরানো বইয়ের দোকানে একটি হাস্যমুখী মোহময়ী ইংরেজ রমণীর সঙ্গে দেখা হল এবং সীতেশ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে পড়ে গেলেন ও পুনর্বার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি ভিক্ষা করলেন। মেয়েটি একটি কাড দিয়ে চলে গেল। পাঁচ মিনিট বাদে সীতেশ তা পড়ে দেখলেন—তাঁকে ঠকিয়ে সীতেশের গিনি ক'টি নিয়ে সে পালিয়েছে। প্রেমিকা ঠক ও পিকপকেট হয়ে অন্তর্হিত হল।

এবার তৃতীয় গল্প—সোমনাথের কথা। অনিদ্রারোগে ভুগে সোমনাথ ইংলাণ্ডের সমুদ্রের ধারে একটি ছোট শহরে বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছিলেন। সেখানে হোটেলে একটি স্নেহময়ী সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাকে সোমনাথ সেভিযার—তারিণী ওরফে "রিনি" বলে ডাকতেন। এই রিনিকে সোমনাথ ভালবেসেছিলেন এবং বছরখানেক সে-পর্ব চলেছিল। রিনিও সোমনাথের জন্য ব্যাকুল হ'ত। যেদিন এ-খেলা চুকল, সেদিন বোঝা গেল রিনি তাকে উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেছিল, প্রণয়প্রার্থী জর্জের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে বিবাহটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চেয়েছিল। সোমনাথেব ও জর্জের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে এই মোহিনী নিজের কাজ উদ্ধার করেছিল।

চতুর্থ গল্প—রায়ের কথা। গল্পকথকের নিজ অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা স্বতন্ত্র। লণ্ডনে বাস করার সময় রায় যে বাড়িতে থাকতেন, সে বাড়ীতে "আনি" নামে একটি দাসী ছিল। রায় তাকে দেখেছিলেন সেবাপরায়ণা-রূপে। আনি তাকে ভালবাসত, কিন্তু সে তা প্রকাশ করে নি। রায় তাকে দেখলে মুখ নামিযে থাকতেন, পাছে অভদ্রতা হয়। তারপর দীর্ঘ দশ বছর বাদে কলকাতায় এক রাত্রে টেলিফোনে আনি তার এই গোপন ভালবাসার কথা রায়ের কাছে প্রকাশ করল। এবং তা কোথা থেকে? পরলোক থেকে। নার্স আনি যে মুহূর্তে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়, সেই মুহূর্তে। এ-খবর শুনে রায় ফোন ছেড়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

চার বন্ধুর প্রেমের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদের সমস্ত অভ্যস্ত সংস্কারকে বিচলিত ও প্রেম-সম্পর্কিত রোমাণ্টিক ধারণাকে বিপর্যস্ত করে। এই গল্পগুলি সাধারণ প্রেমের গল্প নয়। মনে হয়, চৌধুরী মহাশয় আমাদের প্রেম সম্পর্কিত রোমাণ্টিক ধারণাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য এই গল্পগুলি রচনা করেছেন। অথচ গল্পগুলির আকর্ষণ সে-কারণে ক্ষুণ্ণ হয়নি। বিশুদ্ধ গল্পরস ও বিচিত্র স্বাদের জন্য এবং অনুপম বর্ণনায় এগুলি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে, একথাও অনস্বীকার্য। তবে এ গল্পগুলির সম্পদ কোথায়? তা অন্যত্র। নীতিশাসনমুক্ত দায়িত্ববর্জিত বেপরোয়া যৌবনের প্রাণচাঞ্চল্যের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এগুলিতে। আর সেইজন্যই এই চার বন্ধুকে আমরা উপহাস করি না, সমব্যথী হই। এ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী নিজেই বলেছেন—"চারইয়ারী কথার যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগমণি, যেমন উজ্জ্বল, তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর একখানা 'চারইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার ফুল (fool) হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের সোয়ান-সং (swan-song) গাওয়া হয়েছে ওতে।"

'চার-ইয়ারি কথা' সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর মৌলিক গল্প রচনার সূচনা হয় এখানে। এটিই প্রথম গল্প। এটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখেন,—"তুমি যখন প্রথম গণ্ডী পেরিয়েছ তখন আর গল্প লেখায় তোমাকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না—এখন থেকে তোমার এই এক বহু হবার পথে চল্‌ল।" [ফেব্রুয়ারি ১৯১৬। চিঠিপত্র ৫] রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হয়েছিল।

'চার-ইয়ারি কথা'র প্রথম নায়িকা পাগল, দ্বিতীয়টি চোর, তৃতীয়টি জুয়াচোর, আর চতুর্থটি ভূত। চরিত্র-পরিকল্পনা ও কাহিনী-বিন্যাসে 'কথা'র অভিনবত্ব সেদিন চমকের সৃষ্টি করেছিল। প্রমথ চৌধুরীর "সে গল্প ক'টি পড়ে সেকালে যুবক-সম্প্রদায়ের চটক লাগে। এবং সমালোচক-দলের কাছে নতুন বলে গ্রাহ্য হয়।" ['বৈশাখী' ১৩৫২]

এই কৈফিয়তে লেখক বলেছেন, এই চারটি নায়িকাই তাঁর মনগড়া। তবে, এর ভিতরে তৃতীয় গল্পের নায়িকার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, যাকে তিনি রিণী নামে গড়ে তুলেছেন। একটি আধা-ইংরেজ আধা-ফরাসি

মেমের সঙ্গে বিলেতে লেখকের পরিচয় ঘটেছিল। তার নাম কাতি, Katie। কাতি ছিল অতিশয় সুন্দরী ও অতিশয় চালাক-চতুর। তার মধ্যে কিছুটা রহস্য ছিল।

এই কৈফিয়তে প্রমথ চৌধুরী রিণী সম্পর্কে যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য।—

" 'চার-ইয়ারি'র তৃতীয় গল্পে আমি যাকে রিণী বানিয়েছি, তার সঙ্গে যথার্থ কাতির কিছু সাদৃশ্য আছে। যখন 'চার-ইয়ারি' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমাকে বহুলোক জিজ্ঞেস করেছিল যে, এ গল্পটি real কি না। উত্তরে আমি বলি, তা হলে গল্পটি উত্‌রেছে। কেননা যা আগাগোড়া কল্পনার জিনিস, অনেক পাঠকের কাছে তা সত্য বলে মনে হয়েছে। কাতির সঙ্গে আমি ভালোবাসায় পড়ি আর না-পড়ি, সেকালে যুবক-পাঠকের দল অনেকে রিণীর প্রেমে পড়েছিল। আমার একটি ভক্ত বন্ধু কোনো মাসিক পত্রিকায় 'চার-ইয়ারি কথা'র দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তাতে তিনি মুখ ফুটে বলেন যে, রিণীর মতো মেয়ের হাতে পড়ে নাকানি-চোবানি খাওয়াতেও সুখ আছে। আমি তাঁকে বলি, এটা কি লক্ষ্য কর নি যে, রিণী। পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ? আমার বন্ধু উত্তরে বলেন, রিণী যে ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট, রুষ্টতুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে—এ কার চোখ এড়িয়ে যায়? কিন্তু সে জীবন্ত মানুষ, জড় পদার্থ নয়, এইখানেই তার বিশেষত্ব। কাতির সঙ্গে রিণীর প্রধান তফাত এই যে, আমি কাতিকে অনেক রঙ চড়িয়ে রিণী বানিয়েছি। রিণী ও তৃতীয় গল্পের নায়ক সোমনাথের কথাবার্তা প্রায় সবই আমার স্বকপোলকল্পিত। তবে লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য তাদের রক্তমাংসের মানুষ তৈরি করতে চেষ্টা করেছি। ফলে এটি গল্প হয়েছে, অথচ পাঠকের কাছে সত্য ঘটনা বলে ভ্রম হয়।"

এখানেই 'চারইয়ারি কথা'র তৃতীয় গল্প (ও বাকি তিনটি গল্প উত্‌রেছে। এগুলি "গল্প হয়েছে, অথচ পাঠকের কাছে সত্য ঘটনা বলে ভ্রম হয়।" সাহিত্যের এই দুরূহ লক্ষ্যে প্রমথ চৌধুরী 'চারইয়ারি-কথা'য় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাতে আর সংশয়ের অবকাশ নেই। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রধান লক্ষণগুলি এখানেই পাওয়া যায়—নিটোল গল্প, অসাধারণ ভাষাসংযম, সূত্রাকারে গল্পকথন, মন্তব্য-নির্ভরতা, মর‍্যালের আভাস—যে

মর‍্যাল গল্পের অঙ্গীভূত, শিরোনামবিশিষ্ট অধ্যায়-বিভাগ, অপ্রত্যাশিত চমক, মানবরসের সুপ্রচুর আয়োজন, খরধার ভাষা, পরিপাটি বিন্যাস, গল্পরসের সুনিপুণ পরিবেশন। রবীন্দ্রনাথের কথায়, প্রমথ চৌধুরীর গল্পমাত্রেই "পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ, উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত" [চিঠিপত্র, ৫]। 'চার-ইয়ারি কথা'য় তার প্রথম ও সুস্পষ্ট প্রকাশ।

॥ ৩ ॥

"আহুতি" (১৯১৯) কয়েকটি গল্পের সংকলন। বিচিত্র ও বিরোধী রসের সমাবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। 'আহুতি' গল্পে দেখি, একদা সমৃদ্ধিশালী অধুনা ধ্বংসস্তূপ রুদ্রপুরের উপর দিয়ে পাল্কি করে যাবার সময় লেখকের মনে রুদ্রপুরের ঐশ্বর্যের ও পতনের ছবিটি ফুটে উঠেছে। এই গল্পে কারুণ্যের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে ভয়ানক রস। অধুনা ধ্বংসস্তূপের অন্তরালে যে হীন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার এখানে অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে। রুদ্রপুরের বিধবা রানী রত্নময়ীর পুত্রকে হত্যা ও তার প্রতিক্রিয়ায় রত্নময়ীর অদ্ভুত প্রতিহিংসা সাধন এই ঘটনার বর্ণনায় করুণ ও ভয়ানক রস একত্র প্রকাশিত হয়েছে। গল্পটির বর্ণনায় এমন বৈপরীত্যের সমাবেশ হয়েছে যে তা আমাদের অসাড় মনকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলে। জমিদার-বংশের পতন ও তা নিয়ে হাহাকার, এ বিষয়ে অজস্র বাংলা গল্প লেখা হয়েছে, কিন্তু এখানে এই ভয়ানক রসের সঙ্গে করুণ রসের পরিণয় সাধিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। গল্পের সূচনায় যে প্রাকৃতিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা এই মন্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করি: "গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে। অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশ-জোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ⋯এমন সময় হঠাৎ ঝড় উঠল, চারিদিক থেকে এলোমেলোভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল,

চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তারপর দেখি, সেই অগ্নিপ্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিলবিল করছে, ছটফট করছে। এই ব্যাপার দেখে ঊনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চীৎকার করতে লাগল। ক্রমে এই শব্দ মিলে-মিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হল,—সে-হাসির নির্মম বিকট ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে-হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আবার সেই মৃদু, করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হল।" এই "বিকট হাসি ও করুণ ক্রন্দনের" বিপরীত সমাবেশের পটভূমিকায় গল্পটি গ্রথিত হয়েছে। পুত্রহারা রত্নময়ীর দুঃখে আমরা বেদনার্ত হই, কিন্তু শোকপ্রকাশের অবকাশ পাই না।

প্রমথ চৌধুরীর যে বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধে প্রকাশিত, এই গ্রন্থের অপর পাঁচটি গল্প তাকেই পুনর্বার প্রকাশ করেছে। "বড়বাবুর বড়দিন", "একটি সাদা গল্প", "ফরমায়েসি গল্প", "ছোটো গল্প" এবং "রাম ও শ্যাম"—এই পাঁচটি গল্পেরই একটি করে মর‍্যাল আছে।

প্রেম, চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, আমাদের রাজনীতি—এই তিন বিষয়ে উপরোক্ত গল্পগুলি লিখিত হয়েছে। "বড়বাবুর বড়দিন" গল্পে নীতিবাগীশ মধ্যবিত্তের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা দুর্গে প্রমথ চৌধুরী ফাটল আবিষ্কার করেছেন। বড়বাবু ভবানীবাবু সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও যে জীবনটাকে উপভোগ করতে পারলেন না, তার কারণ তাঁর স্বভাবেই নিহিত। অত্যন্ত হাস্যকর অবস্থায় ফেলে বড়বাবুকে অপদস্থ করা হয়েছে। শেষকালে লেখক ঠাট্টা করে বলেছেন, "এ গল্পের মর‍্যাল এই যে, পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়,—এই হচ্ছে ভগবানের বিচার"। আসলে এটি বিশুদ্ধ সামাজিক ঠাট্টা এবং নীতিবাগীশদের পিঠে বীরবলের চাবুক মাত্র।

"রাম ও শ্যাম" গল্পে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতির যে চিরন্তন দুর্বলতা, তাকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। স্বরাজের নামে আমরা যে দলাদলি করি, লেখক অতি দুঃখে সেই কথাটাই রাম ও শ্যামের ছবি এঁকে দেখিয়েছেন। এই গল্পের মর‍্যাল গল্পের শেষে "পুনশ্চ" টীকায় সংযোজিত হয়েছে। তা এই: "এ গল্প পড়ে আমার গৃহিণী বললেন,—কৈ, গল্প ত শেষ হল না? আমি কাষ্ঠ হাসি হেসে উত্তর করলুম—

এ গল্পের মজাই ত এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এ-দেশে কবে যে শুরু হয়েছে—তা কারও স্মরণ নেই, আর কখনও যে শেষ হবে, তার কোনও আশা নেই। এ-গল্প যদি কখনো শেষ হত, তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ-পৃথিবীর সব চাইতে বড় ট্রাজেডি হত না।" এই গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য।—"তোমার শেষ গল্পটি সুতীক্ষ্ণ—ওটা দেশোচিত, কালোচিত এবং পুরুষোচিত। এরকম খরধার এবং সুগঠিত লেখা আর কারো হাত দিয়ে বের হবার জো নেই।" [২১ ডিসেম্বর ১৯১৮। চিঠিপত্র, ৫]

"একটি সাদা গল্প"-এ বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের বয়স্থা মেয়ের বিবাহের ট্রাজেডি চিত্রিত হয়েছে। বাপের বয়সী দোজবরে গ্রামপতির সঙ্গে মেয়ের বিবাহ—অর্থাৎ মেয়েকে বলিদান: বাংলা সাহিত্যে এ নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে। এ-বিষয়ে শরৎচন্দ্র লিখেছেন 'বামুনের মেয়ে', 'অরক্ষণীয়া' —আর প্রমথ চৌধুরী "একটি সাদা গল্প"। প্রমথ চৌধুরী বিনা উচ্ছ্বাসে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের এই নিষ্ঠুর ট্রাজেডিকে বিবৃত করেছেন, কিন্তু তাতেই ক্ষান্ত হননি; শেষে এই মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন, "বর-কনেতে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা প্রথমে আমার কানে ঢোকেনি, তারপর হঠাৎ কানে এল, ক্ষেত্রপতি (দোজবরে বুড়ো) বলছেন, 'যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। একথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা Comedy কি ব্যক্তি Tragedy, তা বুঝতে পারলুম না।" এখানেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

"ফরমায়েসি গল্প"-এ বীরবল বাংলা রোমান্টিক গল্প-কাহিনী-উপন্যাসের শবব্যবচ্ছেদ করে তার মধ্যে যে অসম্ভাব্য হাস্যকর গাঁজাখুরি উপাদান আছে, সেগুলিকে টেনে বার করেছেন এবং বাস্তবের কঠিন ভূমিতে তাদের আছড়ে ফেলেছেন। মকদমপুরের জমিদার রায়মশায়ের বৈঠকখানার সান্ধ্য আসরে ইয়ার-বক্সির সভায় চাটুকার ঘোষাল রায়-মশায়ের ফরমায়েস অনুযায়ী প্রেমের গল্প বলতে শুরু করল। তারপর রায়মশায় ও সভাপণ্ডিতের নির্দেশানুযায়ী জাত-কুল-মান বাঁচিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়ে দিল। বিরোধী উক্তি-প্রত্যুক্তি ও বিচিত্র দাবির সমন্বয়ে ঘোষাল যে-বস্তুটি উপস্থিত করল, তা অত্যন্ত হাস্যকর। এ-গল্পে স্পষ্টই বাংলা রোমান্সের উপর কশাঘাত করা হয়েছে।

"ছোটোগল্প" আর একটি গল্প—যার ময়্যাল "জীবনটা ট্রাজেডি নয়, কমেডিও নয়, কারণ সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও দুই-ই।" এর প্রমাণ প্রফেসারের গল্প। "চার-ইয়ারী কথা"র মূল সুরটা এখানেও উপস্থিত আছে, প্রেমের অসংগতির ও হাস্যকর প্রমাদের দিকে লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই গল্পটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "গল্পটি কিন্তু তুমি সম্পূর্ণ আমার জীবনবৃত্তান্ত থেকে চুরি করেচ—ঠিক গল্পটি নয় কিন্তু তার বৃত্তান্তটি। কিন্তু খুব উপাদেয় হয়েচে। এ'কে মারাত্মক বলা যেতে পারে কারণ, বুদ্ধকে মার যে-রকম প্রলুব্ধ করেছিল, তোমার গল্পের উপসংহারে সেই রকম একটি মারের প্রলোভন উদ্যত আছে—সুকুমার-মতি পাঠকেরা নিশ্চয় নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্বে, আহা ঐ বিধবার সঙ্গে বিবাহ হলেই ত চুকে যায়—কিন্তু তাহলে গল্পের তপস্যা ঐখানেই মাটি।" [১ ভাদ্র ১৩২৫, চিঠিপত্র ৫]

আরও কয়েকটি ছোট গল্প আছে যেগুলি বীরবলীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, কিন্তু তাতে গল্পরস নিতান্তই কম। "অদৃষ্ট", "সম্পাদক ও বন্ধু", "ভাববার কথা" প্রভৃতি গল্পে কথার খেলাই বড় হয়ে উঠেছে। এগুলি পড়লে মনে হয় প্রমথ চৌধুরী তাঁর কয়েকটি প্রিয় তত্ত্বকে স্থাপনা করবার জন্য এগুলি রচনা করেছেন। "সহযাত্রী" ও "পুজোর বলি"—এ দু'টি বিশুদ্ধ গল্প, কোনো তত্ত্ব নেই, আছে জীবনের বিচিত্র রহস্য।

॥ ৪ ॥

"গল্প লেখা" প্রবন্ধটিতে গল্পলেখক ও তার বন্ধু—উভয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী গল্পের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধের কয়েকটি মন্তব্য এখানে তুলে দিচ্ছি, এ থেকেই প্রমথ চৌধুরীর অভিমত বোঝা যাবে।

(ক) "জীবনের যত ট্রাজেডি তোমাদের গল্পলেখকদের হাতে পড়ে সবই কমিক হয়ে ওঠে। যে তা বোঝে না, সে-ই তা পড়ে কাঁদে; আর যে বোঝে, তার কান্না পায়।"

(খ) "যে ধাতু আর রঙ বদলে নিতে জানে, তার হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাংলা হবে।"

(গ) "এই জীবন জিনিসটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্তত ছোটগল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়।"

আবার "কথা-সাহিত্য" প্রবন্ধেও এই একই বিষয় নিয়ে চৌধুরী মহাশয় আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে গল্পের উপাদান ও উৎস নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে যে মন্তব্যগুলি তিনি করেছেন, তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধার করছি।

(ঘ) "গল্পের উপাদান হয় জীবনের বই, না হয় ত কাগজের বই থেকে আমদানি করতে হয়, এ-দুই ছাড়া এমন কোন তৃতীয় বই নেই, যার থেকে আমরা গল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারি।"

(ঙ) "জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা এক হিসেবে অতি সহজ। কেননা, এ-গ্রন্থ সকলের সুমুখেই পড়ে' রয়েছে। কিন্তু আর এক হিসেবে, এ-বই পড়া অতি কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকের এ-পুস্তকের শুধু মলাটের সঙ্গে পরিচয় আছে।"

(চ) "আসল কথা, সাহিত্য-জগতে চুরি বলে কোনও জিনিস নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই, তা শ্যামের কথা হয়ে ওঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভাসাপেক্ষ। যে পরের জিনিস নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সে-ই চারদায়ে ধরা পড়ে।"

(ছ) "আর এক কথা, কাগজের বই থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করা যদি চুরি হয়, তা হলে জীবনের বই থেকে তা সংগ্রহ করাও চুরি। সত্য কথা এই যে, মানুষের সুমুখে দুটি জগৎ পড়ে রয়েছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকৃতির হাতে গড়া, অপরটি মানুষের হাতে গড়া। এই উভয় জগৎ থেকেই মনের খোরাক সংগ্রহ করবার আমাদের সমান অধিকার আছে।"

(জ) "সেকালে ভারতবর্ষ যদি দেদার কথাবস্তু বিদেশে রপ্তানি করে থাকে ত একালে বিদেশ থেকে দেদার আমদানী করবার অধিকার আমাদের আছে। এ হচ্ছে আমাদের পিতৃঋণ পরকে দিয়ে শোধ করানো।"

উপরোক্ত মন্তব্যগুলির মোদ্দা কথা এই যে, প্রমথ চৌধুরী গল্পের রাজ্যে স্থান-কাল ভেদ মানতেন না, জাতের শুচিবায়ু তাঁর ছিল না, পরন্তু

অচেনাকে আপন করে নেবার শক্তিকে উৎসাহ দিতে তিনি রাজি ছিলেন। গল্পকার প্রমথ চৌধুরী এবং প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী—এই দুজনে যে একই ব্যক্তি, একই মন, তার প্রমাণ উপরোক্ত মন্তব্যগুলি। প্রমথ চৌধুরী রোমান্টিক ন্যাকামিভরা গল্পের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ সদ্য-আলোচিত গল্পগুলি। তিনি যে জীবনগ্রন্থের এক অনুরক্ত পাঠক ছিলেন এবং সেই অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ যে আমাদের জীবনের যত হাস্যকর অসঙ্গতির বেলুনকে ব্যঙ্গের খোঁচায় চুপসে দেওয়া, তার প্রমাণ এই গল্পগুলি। পুনশ্চ, বিশুদ্ধ গল্পরসকে চৌধুরী মহাশয় কোনো কারণেই বলি দিতে রাজি ছিলেন না। সামাজিক, সাংসারিক, রাজনৈতিক—কোন আদর্শই তাঁর কাছে সাহিত্যের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে নি।

॥ ৫ ॥

প্রমথ চৌধুরী যে বিশুদ্ধ গল্পরসের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ নীললোহিত ও তার কীর্তিকলাপ অবলম্বনে লিখিত গল্পগুলি। নীল-লোহিতের গল্পগুলি সংসারের চোখে গাঁজা। কিন্তু লেখক নীললোহিতকে অপদার্থ মনে করেন নি। নীললোহিতকে সবাই বলত মিথ্যাবাদী, অথচ তাঁর গল্পে রস পেত। আর সে-সব গল্পের হিরো নীললোহিত স্বয়ং। তিনি করেন নি এমন কোন কাজ ভূ-ভারতে ছিল না, তিনি সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত রকমের বিপদে পড়েছেন ও প্রতিবারই উদ্ধার পেয়েছেন। নীল-লোহিত নানা স্বদেশী ডাকাতির গল্প বলতেন। বলাই বাহুল্য, সে-সবের নায়ক তিনিই। এই সব গল্প লোকমুখে ছড়িয়ে পড়াতে পুলিস নীল-লোহিতকে লাঞ্ছনা করে। ফলে তিনি গল্প বলা ছেড়ে দেন। গল্প বলা বন্ধ করে তিনি চাকরি নিলেন, সংসারী হলেন। লেখক বলছেন, "তিনি বাস করতেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বলতেন—সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ সবই ছিল ঐ কল্পনার রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়। সুতরাং সেই কল্পলোক থেকে টেনে তাঁকে যখন মাটির পৃথিবীতে নামান হল, তখন যে তাঁর শুধু প্রতিভা নষ্ট হল, তাই নয়, তাঁর জীবনও মাটি হল।—দিনের পর দিন তাঁর অবনতি হতে লাগল।" সংসারী কেরানী নীললোহিতকে দেখে দুঃখ করে চৌধুরী

মহাশয় বলেছেন, "লোকে বলে যে, তিনি সত্যবাদী হয়েছেন—কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর স্বধর্ম হারিয়ে, যে জীবন তাঁর আত্মজীবন নয়, অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন—সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা এই ভেবেই খুশী যে, তিনি এতদিনে মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘটনা কী হয়েছে জানেন? নীললোহিতের ভিতরে যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে, যা টিকে রয়েছে, তা হচ্ছে সংসারের ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্রমাত্র।"

নীললোহিতের কীর্তিকলাপ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী যে কটি গল্প লিখেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে অনন্যসাধারণ অ্যাডভেঞ্চার-গল্প। এগুলি অবিমিশ্র গল্পরসসিক্ত নয়। ব্যঙ্গের তির্যকদৃষ্টি এগুলিকে স্যাটায়ারধর্মী করে তুলেছে। স্বদেশী আমলের কংগ্রেসী রাজনীতির গলদ ও ভণ্ডামি ('নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা'), নেতাদের ব্যক্তিগত চরিত্র (ঐ), তৎকালীন স্বদেশী ডাকাতদের নামে প্রচারিত আজগুবি কাহিনী—এসবের প্রতি ব্যঙ্গ, তৎকালীন প্রশাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা ও সকলের শেষে নীললোহিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে, তার দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের মধ্য দিয়ে ('নীল-লোহিত আদিপ্রেম ও অ্যাডভেঞ্চার') একটি ভীরু, কল্পনাপ্রবণ, আড্ডাবাজ চরিত্রের প্রতি প্রসন্ন বিদ্রূপ লেখক করেছেন।

'নীললোহিত আদিপ্রেম' গ্রন্থের গল্পগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন,— "তোমার গল্পগুলি আর একবার পড়লুম। ইতিপূর্বেও পড়েচি। ঠিক যেন তোমার সনেটেরই মত—পালিশ করা, ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ। উজ্জ্বলতার বাতায়ন মগজের তিনতলা মহলে মধ্যাহ্নের আলো সেখানে অনাবৃত। রসাক্ত সুমিষ্টতা দোতলায়, সেখানে রসনার লোলুপতা। তোমার লেখনী সে পাড়া মাড়াতে চায় না।" [২৫ আগষ্ট, ১৯৩৪। চিঠিপত্র, ৫]

প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সবগল্পে ঘটনার চেয়ে মন্তব্য উপভোগ্য হয়ে ওঠে, রসের চেয়ে বুদ্ধির চমক পাঠকের মন টানে। চরিত্রকে সৃষ্টি করার চেয়ে প্রচলিত ঢঙের চরিত্রকে নাকাল করাতেই লেখকের উৎসাহ। কাহিনী সৃষ্টির চেয়ে কাহিনীসৃষ্টির প্রচলিত পদ্ধতিকে বিদ্রূপ করাতেই তাঁর আগ্রহ। গল্পের মোড়কে প্রমথ চৌধুরী বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ জীবন-সমালোচনা উপস্থিত করেছেন। তাঁর গল্পে রসাক্ত সুমিষ্টতা লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। তাঁর গল্পের জগৎ উজ্জ্বলতার বাতায়ন—সেখানে মধ্যাহ্নের আলো অনাবৃত।

৫ | বীরবলী সনেট

স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য, বক্রকটাক্ষসমন্বিত জীবনদৃষ্টি, পরিহাসপ্রিয়তা ও অসাধারণ রসবোধ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বীরবল বাংলা-প্রবন্ধ কবিতার চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, সবুজপত্রের মাধ্যমে সেদিনের নবীন সাহিত্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় লেখায় ক্ষান্তি দেন। স্থূলবিচারে বলা যায়, ১৯১০ থেকে ১৯৪০ : এই ত্রিশ বৎসরের কালসীমার মধ্যে তাঁর সাহিত্যজীবন বিধৃত। এর মধ্যে কাব্যজীবন অতি সংক্ষিপ্ত। "সনেট-পঞ্চাশৎ" (১৯১৩) ও "পদ-চারণ" (১৯১৯) : মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থে তাঁর কাব্যচর্চার ফসল সংগৃহীত হয়েছে।* এই দুটি কাব্যের রচনাকাল (১৯১১-১৯১৬) তাঁর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে। তখন তিনি মধ্যযৌবনে পৌঁছেছেন। প্রথম যৌবনের মদবিহ্বলতা, উল্লাস ও উচ্ছ্বাস তখন অনুপস্থিত। প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য, বিষণ্ণতা ও স্থৈর্যের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর কবিতায়। তাই এগুলিকে বীরবলের দ্বিতীয় যৌবনের কবিতা আখ্যা দেওয়া যায়। বীরবলের কবিতার আন্তরধর্মবিচার পরে করছি। সনেট, পয়ার, ত্রিপদী, ছড়া এবং তেরজা-রিমা ও ট্রায়োলেট : এই দুটি সংকলনে বিধৃত হয়েছে ; সনেট এর মধ্যে বেশি এবং সনেট-রূপকর্মের মাধ্যমেই বীরবলের কবিপ্রতিভা প্রকাশিত। সনেটের গূঢ় নির্মাণকৌশল ও চরিত্ররহস্য বীরবল আয়ত্ত করেছিলেন, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং তার বিস্তৃত পরিচয়ে প্রমথ-প্রতিভার স্বরূপ নিহিত, এই বিশ্বাসে বর্তমান প্রবন্ধের সূচনা।

সনেট-রচনা সম্পর্কে বীরবল নিজেই নানা মন্তব্য করে গেছেন নানা

---

* এই কাব্যদুটি অন্যান্য অপ্রকাশিত কবিতাসহ 'সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৬২) নামে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে।

ক্ষেত্রে, সেগুলি সম্বন্ধে অনুধাবন করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রমথ চৌধুরী তাৎকালিক বাংলা কাব্য-ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি যদিও বারবার বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, তথাপি বীরবলী সনেট পাঠে মনে হয় তা কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন মাত্র। রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল না, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। তৎকালে প্রচলিত রোমান্টিক প্রেমের ন্যাকামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি যে 'সনেট-সপ্তক' (পদ-চারণ) লিখেছেন, তার ভূমিকাটি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ যে কবিগোষ্ঠী রবীন্দ্রকাব্যাদর্শের প্রবল অভিভবে আত্মসমর্পণ করে গ্রামীণ প্রকৃতিতে রোমান্টিক কল্পনার আশ্রয়সন্ধানে ফিরছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও প্রমথ চৌধুরীর কোনো আন্তর যোগ ছিল না। আর কল্লোল-গোষ্ঠীর কবিরা যখন নোতুন জীবনাদর্শের প্রচারে কাব্যসাধনাকে উৎসর্গ করেছিলেন, তখন প্রমথ চৌধুরী কাব্যজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই একথা বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী বাংলা কাব্যজগতে নিঃসঙ্গ পথিক এবং তার কোনো উত্তরাধিকারী নেই। যদি কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে হয়, তবে আমাদের যেতে হবে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যাদর্শের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কাব্যাদর্শের খানিকটা মিল পাই বস্তুচেতনায়, প্রখর বাস্তবজ্ঞানে ও সূক্ষ্ম ছায়াময় রোমান্টিক ভাবকল্পনার বিরোধিতায়। এ প্রসঙ্গে বীরবলের 'দ্বিজেন্দ্রলাল' সনেট স্মর্তব্য। তবে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কারণে "সোনার তরী" ও রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন, তাতে প্রমথ চৌধুরীর বিন্দুমাত্র সমর্থন ছিল না। কল্পনার বাঁধ আলগা করে দিয়ে উধাও হয়ে যেতে উভয়েরই আপত্তি ছিল। তার প্রমাণস্বরূপ দুটি মন্তব্য উদ্ধার করছি।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'আলেখ্য' কাব্যের (১৯০৭) ভূমিকায় লেখেন: "এ পদ্যগুলি কবিতা হোক বা না হোক—প্রহেলিকা নয়। এ গ্রন্থের কোন কবিতা পড়ে' তার মানে দশজন দশরকম বের করে, তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন হবে না।"

বীরবল 'পদ-চারণ' কাব্যের (১৯১৯) উৎসর্গপত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লেখেন: "গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর

কিছু না থাক আছে—rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason। এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই, সুতরাং আশা করি, আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।"

শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে এক পত্রে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'সনেট লেখবার অন্য কারণও ছিল—রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পড়ে পড়ে আমি একটু বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলুম। তার প্রমাণ আমার একটি অপ্রকাশিত কবিতায় ('নূতন কবি') আছে।' [দ্র. 'সনেটপঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা']

আর একটি চিঠিতে বলেছিলেন, 'আমি আসলে গদ্যলেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই Rhyme-এর চর্চা করলে শব্দের পুঁজি বেড়ে যায়। অনেক শব্দ বাদ দিতে হয় আর একটি শব্দের সঙ্গে মেলে না বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল।' (তদেব)

আরো একটি মন্তব্য: 'আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশি।' [শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ৬. ১১ ১৯৪১]

এইসব উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায়, কবিতার ভাষাপ্রয়োগে ও গঠন-কর্মে তিনি যেমন সজাগ, কবিতার ভাববস্তুতেও তিনি তেমনি সতর্ক।

রবীন্দ্র-কবিতার খেলো অনুকরণ বলতে প্রমথ চৌধুরী বুঝেছিলেন, ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত রবীন্দ্র কাব্যের—মানসী থেকে গীতাঞ্জলি'—প্রেরণাহীন নকল কবিতা। যে সৌন্দর্যবাদ ও আধ্যাত্মবোধ এ-পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যে রূপলাভ করেছে, তখনকার কবিরা সাধনা, ভারতী ও নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকায় তারই অন্ধ অনুকরণ করেছিলেন। তাঁদের কবিতায় রবীন্দ্র-কবিতার মৌলিকতা ও প্রেরণা ছিল অনুপস্থিত; রবীন্দ্র-কবিতার ভাষা ও কল্পচিত্র, মসৃণ ও মধুর ছন্দ, সরল ও হৃদ্যরীতি তাঁরা নকল করেছিলেন, আয়ত্ত করতে পারেন নি। প্রমথ চৌধুরী এই অন্ধ রবীন্দ্রানুসারিতাকে বলেছেন 'জোর-করা ভাব আর ধার-করা ভাষা'। এর বিরুদ্ধেই তিনি লেখনী ধারণ করেন। কবিতা যে অনুপ্রেরণার ফল, এ তত্ত্ব রবীন্দ্র-কাব্যে সমর্থিত; কিন্তু বীরবলী কবিতায় তার সমর্থন নেই। বীরবলী কবিতার মূল reason, যা গদ্যের বিশেষ গুণ।

প্রমথ চৌধুরীর কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ?

প্রমথ-জায়া ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীকে লিখিত এক পত্রে (৬ মে, ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ বলেন,

"প্রমথর সনেট-পঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব বিস্মিত হয়েছি। আমার মেঘদূতের যক্ষবধূর বর্ণনা মনে পড়ল—এই বইখানির কবিতা তন্বী, আর ওর দশনপংক্তি তীক্ষ্ণ শিখরওয়ালা, একটিও ভোঁতা নেই—'মধ্যে ক্ষামা', দুটি লাইনের কটিদেশটি খুব আঁট—তার উপরে 'চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা'। এ যেন চোদ্দনলী হার, একেবারে ঠাস গাথুনি আর ভাবটুকু এক একটি নিরেট মাণিকের মতো ঝক্‌ঝক করে জ্বলচে। কেবল আমি এই আশা করছি কবিত্বের এই সুতীক্ষ্ণতা ক্রমে প্রশস্ত হয়ে আস্‌বে, এর ধারালো নবযৌবন পূর্ণযৌবনের রসভারে বিনম্র হয়ে পড়বে এবং এখন পাঠকের মনকে প্রতিছত্রে ফুটিয়ে দেবার দিকে এর যে ঝোঁক আছে সেটা আপনি ফুটে ওঠবার দিকেই সম্পূর্ণ হবে, তখন কবিতা এমন নির্মমভাবে নিখুঁত হবে না। বীণাপাণিকে প্রমথ খড়্গপাণি মূর্তিতে সাজাবার আয়োজন করেছেন। ভাষায় ছন্দে ও ভাবের সংযমে এবং নৈপুণ্যে আশ্চর্য শক্তি প্রকাশ পেয়েছে।" [চিঠিপত্র, ৫, (১৩৫২), পৃ ৩৪]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ নির্ভুল কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয় নি, বীরবলী কবিতা 'বনেট-পরা সনেট-সুন্দরী' ('সনেট-সুন্দরী', পদচারণ) থেকে গিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত এক পত্রে (২২ এপ্রিল, ১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ আরো মন্তব্য করেন,

'তোমার সনেটপঞ্চাশৎ পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোনো লাইনটি ব্যর্থ নয়, কোথাও ফাঁকি নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরী—তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকমক করছে, কোথাও অশ্রুর বাষ্পে ঝাপসা হয় নি—কেবল কোথাও যেন কিছু কিছু রক্তের দাগ লেগেছে। বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।' [চিঠিপত্র, ৫, পৃ ১৬৭]

বীরবলের 'হাসি ও কান্না' এবং 'আত্মকথা' সনেটে এই অভিমতের সমর্থন পাই।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর উদ্দেশে লিখিত মন্তব্যে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, তিনি পদ্যে গদ্যের মনোভাব নিয়ে আসতে চেয়েছেন। সংযত আবেগ, ঋজু ভাষা, তীক্ষ্ণধার হাস্য ও নির্মম বিদ্রূপে বীরবলী সনেট ঝক্‌ঝক্ করছে। এতে নেই কোনো ভাবপ্রবাহ, নেই কোনো সংগীত, নেই উচ্ছ্বাস, নেই রোমান্টিক ব্যাকুলতা। আছে বাস্তবজ্ঞান, আছে যুক্তি, আছে সতর্ক শব্দভাবনা ও তর্কপ্রবণতা। 'কিন্তু' 'পরন্তু' 'অথচ' 'অর্থাৎ'—এইসব যুক্তিবাচক অব্যয়কে তিনি কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন, গদ্যমনোভাব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

যুক্তি ও বাস্তবের কঠিন ভূমিতেই প্রমথ-কবিতালক্ষ্মী বিচরণ করেছেন এবং কল্পনার টানে তিনি শূন্যবিহারী হয়ে যান নি এবং মন তা হতে চাইলেও তাকে বস্তুচেতনা পরিত্যাগ করতে দেন নি,—এ সত্য প্রমথ-কাব্যপাঠকের অবিদিত থাকা উচিত নয়। তাঁর কালে, বিশের দশকে রবীন্দ্রানুসারিতার নামে যে রোমান্টিক জলো কল্পনাসর্বস্বতা ও ভাবোচ্ছ্বাস প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার বিরুদ্ধে সুচতুর প্রতিবাদ বিধৃত হয়েছে 'সনেট-পঞ্চাশৎ' কাব্যের শেষ সনেটে। এই 'আত্মকথা' সনেটে বীরবলের কাব্যদর্শন স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে:

> কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কুর,
> দু'দিনে সবাই যাবে বেবাক্ ভুলিয়ে।
> কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
> নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর॥
> হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
> ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
> প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে,
> স্বর্গ-মর্ত্য-মাঝখানে, মত ত্রিশঙ্কুর!
> নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
> আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন॥
> কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
> মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
> তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
> মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই!

অশরীরী ভাবকল্পনায় অনুৎসাহ এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের বস্তুজগতের প্রতি অনুরাগ প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় অবশ্যলক্ষণীয়।

প্রমথ চৌধুরী কাব্যচর্চা করেছেন মধ্যযৌবনে পৌঁছে এবং তার স্থায়িত্বকাল মাত্র ছয় বৎসর—১৯১১ থেকে ১৯১৬। এর কারণ কি? বোধ করি, তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমকালে কবিতারাজ্যে আর কাউকে জয়পতাকা প্রোথিত করতে হবে না। শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছেন, "ইংরাজীতে যাকে বলে exuberance সে জিনিষ যে প্রতিভার ধর্ম তা রবিবাবুর রচিত সাহিত্য থেকেই প্রমাণ হয়। আমাদের আর পাঁচজনের যে নাম করেছ তাদের কারও নাম রবিবাবুর নামের পাশে উল্লেখ করা যেতে পারে না। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে যা সম্ভব তা আমরা করেছি, হয়ত পরেও করব। কিন্তু আমাদের মনের মাপ আমরা জানি, অন্ততঃ আমি ত জানিই। তবে আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলে যে আমার পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করা কর্তব্য, এমন কথা আমি কখনো মনে স্থান দিই নি। আমার বিশ্বাস আমরা যে যা পারি সেইটুকুই ভাল করে করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য।" (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪)। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি চলে গেলেন গদ্যরাজ্যে। সেখানে যুক্তি ও সত্যাদিদৃক্ষা, সন্দেহ ও সংশয়, পরিহাস ও ব্যঙ্গ তাঁর পাথেয়।

'কৈফিয়ৎ', 'কবিতা লেখা', 'প্রেমের খেয়াল', 'পত্র' প্রভৃতি কবিতায় নীরবল কাব্যচর্চায় তার আসক্তি ও নিবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। আর 'গজল', 'সনেট', 'ব্যর্থ জীবন', 'হাসি ও কান্না', 'উপদেশ', 'বন্ধুর প্রতি' ও 'আত্মকথা' প্রভৃতি কবিতায় কবিমানসের আন্তর পরিচয়টি প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিচয় গ্রহণের আগে সনেটের গূঢ় নির্মাণকৌশল আয়ত্ত করতে প্রমথ চৌধুরী যে-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে আসা যাক্।

॥ ২ ॥

বিশুদ্ধ ক্লাসিকাল সনেট বলতে ইতালীয় সনেটকেই বোঝায়। তার শ্রেষ্ঠ শিল্পী পেত্রার্কা। ফরাসি সনেটে ও ইংরেজি সনেটে

ইতালীয় সনেটের বিশুদ্ধি ও সংহতি অনেক ক্ষেত্রেই রক্ষিত হয় নি। বাংলা সনেটের আলোচনা করলে দেখা যায়, ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজী, এই তিন দেশীয় সনেটের প্রভাবই রয়েছে। সনেটের জন্মভূমি ইতালিতে বহু পরীক্ষার পর সনেটের মূল রহস্য—সনেটের মধ্যবর্তী ভাবের আবর্তন-লীলা আবিষ্কৃত হয় এবং পেত্রার্কার হাতেই তার পূর্ণবিকাশ ঘটে। সনেটের সার্থকতা ঐ মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতেই নিহিত। সনেটে অষ্টক-বন্ধের শেষে এবং ষট্‌ক-বন্ধের প্রারম্ভে ভাবের আবর্তনসন্ধি। ছন্দঃস্পন্দ ও ভাববন্ধের এই আবর্তনের সম্যক্ সঙ্গতিতেই ইতালীয় সনেটের সার্থকতা।

সনেটের এই দুরূহ মানদণ্ডে যদি বাংলা সনেটকে বিচার করা যায়, তবে দেখা যায় একমাত্র মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই ইতালীয় সনেটের কঠিন আদর্শ অটুট আছে। রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে পেত্রার্কার ইতালীয় সনেটের উপরোক্ত আদর্শের অনুসরণ করেছিলেন 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে, কিন্তু সেখানেই তিনি ঐ আদর্শচ্যুত হয়েছিলেন। ফরাসী ও ইংরেজী সনেটের অনুসৃতিও এতে লক্ষ্য করা যায়। রঁদেল ও রঁদে'র স্তবক-বিন্যাস, শঁ রয়্যাল ও শেকস্‌পীয়রীয় মিল-বিন্যাস রবীন্দ্রনাথের সনেটে দেখা যায়।

প্রমথ চৌধুরী পেত্রার্কীয় সনেটের কঠিন আদর্শকে রক্ষা করেন নি। যদিও তিনি 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর প্রথম সনেটে বলেছেন, "পেত্রার্কাচরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ", তথাপি বীরবলী সনেটে ফরাসী সনেটের অনুসৃতিই সমধিক লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বহু সনেটেই পেত্রার্কার অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ রক্ষিত হয় নি। ভাবের আবর্তন-সন্ধি-মতবাদে তাঁর বিশেষ প্রীতি নেই, ষট্‌কের প্রথম দু চরণে—নবম দশম চরণে—ভাবকে গুটিয়ে নিয়ে শেষ চার চরণে নোতুন করে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

ফরাসী সনেটের একটি বিশেষ প্রকার ভেদে অষ্টক-বন্ধের পরে ষট্‌ক-বন্ধ শুরু হয় নবম দশম চরণের অন্ত্যমিলে। মিত্রাক্ষর ষট্‌কবন্ধ শুরু করার এই রীতি Renand, Ronsard প্রমুখ ফরাসী সনেটকার প্রবর্তন করেন। প্রমথ চৌধুরী এই রীতিরই অনুসরণ করেছেন। এই রীতি-অনুসৃতি এর আগে পাই রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের 'চরণ', 'হাসি' সনেটে। 'দেশ' পত্রিকার ১৩৬৩ সালের সাহিত্য-সংখ্যায় প্রকাশিত

প্রমথ চৌধুরী-লিখিত কয়েকটি পত্রে 'ফরাসী সনেটের ছাঁচ অবলম্বন' করার স্বীকৃতি আছে। 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রতিটি সনেটই ফরাসী রীতিতে রচিত। প্রথমে দুটি চৌপদী, তারপর একটি দ্বিপদী, তারপর আর-একটি চৌপদী। 'পদ-চারণ'এর কয়েকটি সনেট ইতালীয় সনেটের কঠিন আদর্শে রচিত অর্থাৎ অষ্টক ও ষট্‌ক—দুটি স্পষ্ট ভাগে তা বিভক্ত ও অষ্টকের সমাপ্তি ও ষট্‌কের সূচনায় ভাব ও ছন্দের আবর্তন (Volte) ও এই আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্যরক্ষার কঠিন আদর্শ অনুসৃত হয়েছে।

পেত্রার্কার আদর্শ সনেট-রীতিতে অষ্টকে সংবৃত বিবৃত চতুষ্ক-যুগল রচনা করা হয় ও ষট্‌কে ত্রিক-যুগল বিবৃত এবং মিত্রাক্ষর-যুগ্মকে সনেটের সমাপ্তি সেখানে অনভিপ্রেত: প্রমথ চৌধুরী এই কঠিন আদর্শ থেকে বারবার বিচ্যুত হয়েছেন এবং তার জন্য তিনি লজ্জিত নন। তিনি বলেছেন, "ইতালীয় ধরণের সনেট লেখা আরও কঠিন। মধ্যে হাঁফ ফিরবার অবসর পাওয়া যায় না।" (দ্র দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩। পৃ. ২৪)। তাই কেবল ফরাসী সনেটের মুক্তি তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি, শেক্‌সপীয়রীয় সনেট-রীতিও মাঝে মাঝে অনুসরণ করেছেন ইতালীয় সনেটে অন্তিম মিত্রাক্ষর-যুগ্মক বা অন্ত্যমিলযুক্ত পয়ার নিষিদ্ধ, কিন্তু শেক্‌সপীয়রীয় সনেটে তার বহুল-অনুসৃতি। 'চোরকবি', 'তাজমহল', 'ভুল' ও 'তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন' সনেট তার উদাহরণ। 'পত্রলেখ' সনেটের ভাবতরঙ্গ ত্রিধাবিভক্ত। অষ্টকে ভাবের বিরাম, ষট্‌কে প্রথম যুগ্মকে (নবম দশম চরণে) প্রবর্তিত ভাবের দশম চরণেই পূর্ণতাপ্রাপ্তি, পুনর্বার শেষ চতুষ্কে ভাবের নোতুন আবর্তন। সনেট-কলাকৃতি-বিচারে এই সনেটটি দোষদুষ্ট, প্রিয়নাথ সেনের এই অভিযোগের (দ্র. 'সনেট-পঞ্চাশৎ' প্রবন্ধ) উত্তরে প্রমথ চৌধুরী এক পত্রে বলেছেন, "এতে যে কোনরূপ রসভঙ্গ হয়েছে এমন বিশ্বাস আমার নয়। বংশীধারীর পক্ষে ত্রিভঙ্গরূপ ধারণ করাটা অন্ততঃ এদেশে শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়।" (দ্র. দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৩)।

এই আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পেত্রার্কীয় সনেটের কঠিন আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষায় তাঁর আস্থা ছিল না। তাঁর ফরাসী সাহিত্য তথা ফরাসী সনেট-প্রীতি তাঁকে বরং বিপরীত পথেই চালিত করেছিল। তাই বীরবল যখন নিজে লেখেন,

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপর ক্রন্দন।

তখন মনে হয় এ-কথা তিনি অন্তরের সঙ্গে লেখেন নি: অবশ্য প্রতিভার লক্ষণই যে, তা কোনো নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ নয়। তথাপি একথা স্মর্তব্য যে, নিয়মের কাঠিন্য নিপুণ শিল্পীর পক্ষে বন্ধন বা বিঘ্ন নয়, প্রতিভার বিকাশে তা সহায়ক, যেমন মধুসূদনের ক্ষেত্রে। তবে প্রমথ চৌধুরী কেন পেত্রার্কার চরণবন্দনা করেছেন যদিও তাঁর পদানুসরণ করেন নি? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। পেত্রার্কা ও সনেট: এ দুটি পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ বলেই তা তিনি করেছেন (দ্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্র, 'দেশ' সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৩, পৃ. ২৩)।

সনেট রচনায় কেন তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার উত্তর তিনি দিয়েছিলেন শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে জীবনের শেষভাগে লিখিত দুটি পত্রে (দ্র. দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৩)। এ দুটি পত্রে তিনটি কারণ বীরবল দেখিয়েছেন। সমকালীন কাব্যে চিন্তায় শৈথিল্যের প্রতি প্রমথ চৌধুরীর বিতৃষ্ণা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার খেলো নকল পাঠে বিরক্তি, ভাস্কর্যধর্মী সনেটের প্রাণ তার আঙ্গিকের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তার চর্চায় ইমোশনের রাশ টেনে ধরার ও সদাজাগ্রত থাকার সুযোগলাভ।

এ প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য। বীরবল বলেছেন, "আমার সনেট যদি কবিতা হয়, তাহলে সে কবিতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী।......art অনেকটা বন্ধনের সামগ্রী। আমি যে সনেট লিখেছি সে অনেকটা experiment হিসাবে। যদি তা সত্ত্বেও আমার কতকগুলি সনেট উতরে থাকে তা এই সনেটের বাঁধাবাঁধি নিয়মের গুণে। আমার সনেটের অন্তরে হয়ত art-এর চাইতে artificiality বেশী।" (শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ৬. ১১. ৪১ তারিখে লিখিত পত্র)।

বীরবলী সনেটের কলাকৃতি ও আঙ্গিকের প্রসঙ্গ আলোচনা শেষে এবার কাব্যবিচারের শেষ পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি। বীরবলী সনেটে আর্ট বেশী, না, আর্টিফিশিয়ালিটি বেশী? এ কি শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, না, তদপেক্ষা বেশি-কিছু? এই প্রশ্নের মীমাংসায় এই দুই কাব্যগ্রন্থের মূল্য নির্ভরশীল।

॥ ৩ ॥

'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম সনেটে বীরবল স্পষ্টভাষায় বলেছেন :

বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
একথা পণ্ডিতে বুঝে মূর্খে লাগে ধন্ধ।

প্রমথ চৌধুরীর কবিমানসে কাব্যবাণী সাকার হয়েছিল, তা মনোযোগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

রবীন্দ্রকাব্যের খেলো নকল পড়ে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তাই সমকালীন রোমান্টিক ভাবাতিরেক ও উচ্ছ্বাসের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন 'উপদেশ' সনেটে :

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন!
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা!
বড় কবি কিম্বা হতে যদি তব আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জনসাধারণ,
শেখো যদি সমাজের, করি প্রাণপণ,—
দরকারি ভাব, আর সরকারী ভাষা!
যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে॥

বীরবলের কাব্যাদর্শ এর থেকে অনুমান করা যায়। 'দরকারি ভাব আর সরকারী ভাষা'র প্রতি তাঁর ছিল একান্ত অনীহা, জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা' নিয়ে কবিতা-রচনার ব্যর্থ প্রয়াসে তাঁর আগ্রহ ছিল না এবং সত্য ও বস্তুকে ত্যাগ করে অবাস্তব রোমান্টিক কল্পনার ফানুষ ওড়াতে তিনি ব্যগ্র হন নি। স্পর্ধিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট প্রবন্ধকার বীরবল এখানে উপস্থিত। জনপ্রিয়তা বা পাঠক-অভিনন্দনের জন্য তাঁর কিছুমাত্র লোলুপতা ছিল না, তাই স্পষ্টভাষায় বলেছেন 'পাঠকের মুখ চেয়ে লিখি নি কেতাব' ('ব্যর্থজীবন')। একথা এক শ বার সত্য, এখানেই কবি প্রমথ চৌধুরীর স্বাতন্ত্র্য।

চল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে বীরবল কবিতা রচনা শুরু করেন এবং ছ' বৎসরের (১৯১১-১৭) মধ্যেই তার সমাপ্তি। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে পৌঁছে তাঁর এই কাব্যচর্চায়, আগেই বলেছি, দ্বিতীয় যৌবনের বন্দনা গীত হয়েছে। 'চার-ইয়ারি কথা' (১৯১৬) এবং 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদচারণ' (১৯১৯): একই সময়ে লেখা। তিনটি গ্রন্থে দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan-song গাওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কবি প্রমথ চৌধুরী যৌবনের ও প্রেমের কবি ছিলেন, এবিষয়ে আমার সন্দেহ মাত্র নেই। আপাত-ব্যঙ্গ, তির্যক-কটাক্ষ-সমন্বিত দৃষ্টির (bantering attitude) পেছনে একটি যৌবনরাগে সমুজ্জ্বল প্রেমমুগ্ধ তরুণ কবিমন বর্তমান, এই তিনটি গ্রন্থপাঠে একথাই আমার মনে হয়েছে। 'চার-ইয়ারি কথা'র অপূর্ব প্রেম-পরিবেশ বর্ণনার সঙ্গে এই দুটি কাব্যের কয়েকটি সনেটের মিল আবিষ্কার করা কঠিন নয়। 'চার-ইয়ারি কথা'য় রোমান্টিক প্রেমকে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে গেলে কি রকম নাকাল হতে হয়, তার সরস বর্ণনা আছে এবং তৎকালীন বাংলা রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর তীব্র ব্যঙ্গ এই গল্পগ্রন্থটি, তা সবাই জানেন। আলোচ্য তিনটি গ্রন্থেই রোমান্টিক প্রেমসাধনার ন্যাকামি, অতিরেক ও উচ্ছ্বাসকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্রিয় বস্তুর বিকৃতি বা ন্যাকামি দেখলেই লোকে তাকে ব্যঙ্গ-উপহাস করে, মূল বস্তুকে করে না, এ সত্য যদি স্মরণে রাখি, তবে আমাদের স্বীকার করতে বাধা ঘটে না যে, প্রমথ চৌধুরী মূলত যৌবনের উপাসক-কবি ছিলেন। আর সেজন্যই তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে ও জীবনে প্রচলিত কিশোরীভজনার তীব্র নিন্দা করেছেন 'বালিকা-বধূ' সনেটে:

> বাঙ্গলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
> যুবতী ছাড়িয়া এবে ভজিছে বালিকা।
> তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
> চোঁয়াতে প্রয়াস পায় তাজা প্রেম-মধু।
> বলিহারি কবি-ভর্তা এম. এ. আর বি. এ.
> বাল-বধূ লতিকার ঝুলিবার তরু!
> মানুষ মরুক সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
> বেঁচে থাক্ কবিতার যত কাম-গরু!

যৌবন ও প্রেমের বন্দনা এ দুটি কাব্যগ্রন্থে ইতস্তত ছড়ানো আছে। তেরজা-রিমা ছন্দে রচিত দীর্ঘ 'কৈফিয়ৎ' কবিতাটিকে মনের বাসনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন বীরবল,

যৌবনে বাসনা ছিল, দুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে সাহিত্যের পত্রে।

কিন্তু হায়! সংসারের শাসনে তা পূর্ণ হবার অবকাশ ঘটল না। আত্মার আলো হারিয়ে, প্রাণের আনন্দভ্রষ্ট হয়ে কবি যৌবনপ্রান্তে পৌঁছে অনুভব করলেন 'হইল মনের দফা প্রায় নিকেশ'। তাই কবি তখন,

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান।
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।

স্বল্পকালস্থায়ী দ্বিতীয় যৌবনের কাব্যফসল 'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ'-এ সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু সময় সংক্ষেপ, জীবনের যাত্রা প্রায়-সমাপ্ত, তাই তিনি ধ্রুপদ-ধামার ছেড়ে চুটকি-গজলে যত আশা-ভালবাসা উপস্থিত করেছেন ('গজল') এবং সনেটের ক্ষুদ্রকায়ে বাণীকে বন্দনা করেছেন। ছোটখাট তান রচনার জন্য কবি এখন,

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎ প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্নেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।
ইহাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হতে পারে কিন্তু পাকা পদ্য,
প্রকৃতি যাহার 'জেঠ', আকৃতি 'কনেঠ'।
অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি চোদ্দ।

প্রমথ-মানসিকতার সঙ্গে সনেট-প্রকৃতির অন্তরঙ্গ মিল ঘটেছিল বলেই সনেট প্রমথ-প্রতিভার কাব্যবাহন হয়েছিল। তাই বারবারই তিনি

সনেট-সুন্দরীর রূপবর্ণনা করেছেন। 'পদ্দ-চারণ'-এর 'সনেট-সুন্দরী', 'সনেট', 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর 'সনেট' তার পরিচায়ক। বনেট-পরা সনেট-সুন্দরীর যৌবন-বর্ণনা পাই 'সনেট-সুন্দরী'তে :

বিগাঢ় যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁট সাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে' গড়া স্বর্ণ-পাঞ্চালিকা।
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র,
কলার শাসনে শান্ত মন তার রুদ্র,
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা।
সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি-পরশে
ছিন্নভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নিগ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে নয়নের লোর।

দ্বিতীয় যৌবনের কবি বোধ করি বিগাঢ়যৌবনা তন্বী সনেট-সুন্দরীর কাছেই শান্তির আশ্রয় পেয়েছিলেন।

একদিন যে যৌবনের মদালসে মহোৎসব-আনন্দে উচ্ছ্বাসে কবিজীবন ভরে উঠেছিল, তার কিছু সুখস্মৃতি এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে।—প্রেমের রসের যৌবনের আনন্দ-উপলব্ধি তাঁর জীবনে ঘটেছিল এবং 'কৈফিয়ৎ' কবিতায় উল্লিখিত সাংসারিক অকৃতকার্যতায় সান্ত্বনা দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাই, 'প্রেম খেয়াল', 'পূর্ণিমার খেয়াল', 'ভাল তোমা বাসি যখন বলি', 'পত্র' কবিতায় ও 'ভুল', 'ফস্‌লে গুল্‌মে ম'য়্‌সে তৌবা?', 'বন্ধুর প্রতি', 'একদিন', 'সুরা', 'রোগশয্যা', 'গজল', 'স্মৃতি', 'রূপক' 'স্বপ্নলঙ্কা' ও 'প্রতিমা' সনেটে।

অলসমধুর যৌবনস্মৃতিচারণায় কবি বলেছেন,

আজি সে ফুলের গন্ধ রয়েছে সঞ্চিত
অস্পষ্ট স্মৃতির মত, সব মন ছেয়ে।

দেবতার স্থিরনেত্রে, পূর্বপরিচিত,
রত্নদীপ-শিখা সম, দূরে আছে চেয়ে! ('স্মৃতি')

অতিক্রান্ত যৌবনের প্রেমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন,

নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার! ('ভুল')

'একদিন', 'সুরা', 'বন্ধুর প্রতি', 'প্রিয়া' সনেট ও 'প্রেমের খেয়াল', 'ভাল তোমা বাসি যখন বলি' কবিতায় সেই প্রেম ও যৌবনলীলার ঈষৎ পরিচয় রয়েছে। দ্বিতীয় যৌবনের বিষণ্ণ অপরাহ্ণে কবি প্রথম যৌবনের সেই প্রতপ্ত মধ্যাহ্নের দিনগুলি-স্মরণে এই কবিতাগুলি রচনা করেছেন; এদের মধ্য থেকে যৌবনোপাসক প্রেমিক কবিমানসটিকে চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না।

॥ ৪ ॥

জীবন-সায়াহ্নে উপনীত হয়েও কবি জীবনবিমুখী নন। বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, তাঁর জন্য নয়; দুঃখের গান গাইতে তিনি রাজী নন। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে নিয়ে যে সনেট বীরবল লিখেছিলেন, সে বর্ণনা তাঁর সম্পর্কেও প্রযোজ্য: 'উদার-আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হাসি'। দুঃখবিরোধিতা ও জীবনাসক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'হাসি ও কান্না' সনেটটিতে। এখানে প্রমথ-কবিমানসের একটি পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য:

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি॥
আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,

উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাজি ॥
হৃদয়ে কৃপণ হয়ে ধনী হতে চায়
সুখ তারা দেয় নাকো, তাই দুঃখ পায় ॥
তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ ॥

'জীবনের প্রতি ব্যর্থ পল স্মৃতিতে একত্র' করে অতীত কুড়িয়ে চলার পথে হাসিই পাথেয়, তা কবি বিশ্বাস করেন ('হাসি' সনেট)। 'ধরণী' সনেটে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয় বৈরাগ্যের প্রতিবাদ :

কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছে প্রাচীন ?
আজিও বসন্তে এসে কোকিল পাপিয়া
মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে ডাকে 'পিয়া' 'পিয়া'।

বার্ধক্যের স্বপ্ন ভেঙে যৌবনের উপাসনায় কবি আত্মনিয়োগ করেন। দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়—

আজিও প্রকৃতি আছে সবুজ সৌখীন।
নরনারী আজো ধরে পরস্পর বক্ষে—
অমানুষ পরে শুধু ডোর ও কৌপীন!

'ব্যর্থজীবন' সনেট কবির নির্ভয় ঘোষণা : 'তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে।' এই জীবনানুরাগ কবিকে প্রৌঢ় সায়াহ্নের ব্যর্থতা ও হতাশা থেকে রক্ষা করেছে।

এই জীবনানুরাগেরই আরেক প্রকাশ ঘটেছে ফুল- ও প্রকৃতি-বিষয়ক সনেটগুচ্ছে। বর্ণভাণ্ডের সমস্ত রঙ উজাড় করে দিয়ে কবি চিত্র অংকন করেছেন। 'চোরকবি' সনেটে এই বর্ণালিম্পনের নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। অবিদ্যাসুন্দরীর কি অসাধারণ বর্ণনা!

কনকচম্পকদামে সর্বাঙ্গ আবরি
সুপ্তোত্থিতা শিথিলাঙ্গী বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী।

'অপরাহ্ন' সনেটে যৌবনের স্বর্ণপুরীতে গোলাপ শব্দটির পুনরুক্তি পাঠক-মনকে জাগ্রত করে তোলে :

গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপের রাশি !
গোলাপের রঙ ছিল অনন্ত আকাশে,
গোলাপের গন্ধ ছিল ধরাতে বাতাসে,
নারীর অধরে ছিল গোলাপের হাসি।

সঙ্গীতরাগিণী ও ফুল-বিষয়ক সনেটগুলিতে কবির পঞ্চেন্দ্রিয়-উপাসনার সার্থক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। 'কাঁঠালী চাঁপা', 'করবী', 'কাঠ-মল্লিকা', 'রজনীগন্ধা', 'গোলাপ', 'ধুতুরার ফুল', 'বাহার', 'পূরবী', 'গজল' (সনেট-পঞ্চাশৎ), 'বনফুল', 'চেরিপুষ্প' সনেটনিচয়ে এই পরিচয় বর্ণালিম্পনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই সনেটগুলির শব্দ-চয়নে ও ভাব-রূপায়ণে যে স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য ও প্রচলিতকাব্যরীতিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, তা-ই এদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। এগুলির শিল্পকর্ম ত্রুটিহীন, বর্ণালিম্পন নিপুণ ও ভাব অতিশয় মৌলিক। প্রতিনিধি রূপে 'কাঁঠালী চাঁপা' সনেটটির বিশেষ উল্লেখ করা যায়। বাচন-ভঙ্গিতে ও উপস্থাপনে এমন একটি মৌলিকতা আছে যে তা পাঠকের প্রচলিত সাহিত্যবিশ্বাসকে স্পর্ধাভরে উপেক্ষা করে এবং পাঠককে তা মেনে নিতে বাধ্য করে। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'চম্পক' ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা'র সঙ্গে প্রতিতুলনায় 'কাঁঠালী চাঁপা'-র স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় কেবল ইন্দ্রিয়োপভোগ, বর্ণের সমারোহ; সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় স্বর্ণলাবণ্যময়ী বসন্তের অন্তিম নিঃশ্বাসে জাত চম্পাসুন্দরীর বর্ণনা, আর বীরবলের সনেটে আবেগবহিত কাটা কাটা বাক্যে কাঁঠালী চাঁপার স্বরূপ উদ্ঘাটন। কাঁঠালী চাঁপার বর্ণনায় কবি প্রথানুগত্যের বিরোধিতা করেছেন; তাঁর মন্তব্য পাঠকমনকে এক খোঁচায় সচেতন করে তোলে যখন পড়ি :

তোমার কাঁঠালী গন্ধ নাহি রহে ছাপা,
ছুটে আসে, ভেদ করি পাতার গম্বুজ।
ঠিক করে হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল !

'গোলাপ' সনেটে গোলাপের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি সাহিত্য-প্রথাকে

সম্পূর্ণ অস্বীকার করে গোলাপকে বলেছেন 'ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল'। শুধু তাই নয়, আরো বলেছেন,

সোহাগে গলিয়া তুমি হওবা আতর,
গুম্ফাসনে বসে কর বেগম কাতর!

আমাদের প্রচলিত ধারণাকে এই বর্ণনা বিপর্যস্ত করে।

॥ ৫ ॥

কিন্তু প্রমথ-কবিমানসের এই-ই শেষ কথা নয়। কবিমানসের 'অন্বেষণে'র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন।
খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়,—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে হবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-সুর॥

কবির এই অরূপ-সন্ধান ও অনাগত সুরের অন্বেষণ যে ব্যর্থ হয় নি, তা অনুরাগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। উচ্চকোটির গীতকাব্য-ভাবনা যে তাঁর অধিকারে ছিল, সে বিষয়ে আমার কোনো সংশয় নেই।

সে সংশয় অপনোদিত হয় তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতার আলোচনায়। 'বিশ্বরূপ', 'বিশ্বকোষ', 'বিশ্বব্যাকরণ', 'আত্মপ্রকাশ' সনেটে তিনি জীবনবিরোধী বিশ্বরহস্যসন্ধানীদের ব্যঙ্গ করে বলেছেন,

বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া! ('বিশ্বকোষ')

বিশ্বরহস্যকে মহাকাব্যে ধরার বৃথা প্রয়াস না করে তিনি চুটকিতে গজল গাইবার পক্ষপাতী ছিলেন:

আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত
অন্তরে সাঞ্চত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দশ লোক। ('বিশ্বরূপ')

তাই তিনি জীবনসায়াহ্নে নিরাশা ও ব্যর্থতার দ্বারা পরাভূত হন নি। তাঁর চুটকিতে বিশ্বদর্শন সার্থক হয়েছিল। তার প্রমাণ 'মুশকিল-আশান' সনেটের অন্তিম চতুষ্ক:

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা'
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুশ্‌কিল-আশান'।

কবির এই জীবনদর্শন ব্যর্থ হয় নি। তিনি তাঁর প্রিয়াকে আহ্বান করেছেন এই বলে:

প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
যোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর।

জীবনরসিক দুঃখবিরোধী পঞ্চেন্দ্রিয়োপাসক: এই তাঁর যথার্থ পরিচয়।

আর দুটি সনেট উদ্ধার করাব লোভ সংবরণ করা দুঃসাধ্য কেননা এ দুটিতে বীরবলের কবিপ্রতিভা নিজেকে অনাবরণরূপে উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং সদাসঙ্গী ব্যঙ্গ ও পরিহাসকে ত্যাগ করে কবি উচ্চারণ করেছেন তাঁর কাব্যজীবনের ব্যর্থতা ও সার্থকতার শেষ ভরতবাক্য। এখানে কবির কণ্ঠ বিদ্রূপতীক্ষ্ণ ন', তা গভীর ও নম্র। মৃদু কণ্ঠে অন্তরঙ্গ সুরে তিনি জীবনাসক্তির ও মানবজীবনের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনার পরিচয় দিয়েছেন।

'রূপক' সনেটে জীবনানুরাগের ও প্রকৃতি-উপভোগের আন্তরিক গভীর পরিচয় আছে। ব্যঙ্গের নির্মোক খুলে ফেলে কবি আজ অন্তরঙ্গ সুরে তাঁর জীবনসত্যটি উচ্চারণ করেছেন:

কথনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমন্তের রাত্রি হেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ॥
বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,

চিদাকাশে দেয় জেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ॥
কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস॥
বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবারাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন-কামিনী॥

ইন্দ্রিয়াশ্রিত রূপজগতের কবি প্রমথ চৌধুরীর সম্পূর্ণ পরিচয়টি এখানে প্রকাশিত। অষ্টকে প্রকৃতি-রূপের যে সার্থক বর্ণনা, ষট্‌কে তা কবির জীবনে সত্যরূপে গৃহীত। কবির বৈরাগ্যবিরোধী জীবনদৃষ্টি অন্তিম যুগ্মকে বিধৃত হয়েছে।

আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত মানবজীবনের অতি-পরিচিত নিষ্ঠুর সত্যটি 'প্রতিমা' সনেটে সর্বজনীন আবেদনে পাঠকের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। 'ভুল' সনেটে কবির স্মরণীয় উক্তি: 'হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার।' তবু নিরাশার সুরে কবি তাঁর কাব্যবীণার শেষ ছড়টি টানেন নি। সকল কবির যা চির-আকাঙ্ক্ষিত, আমাদের কবি তাকেই খুঁজেছেন, 'অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত সুর' ('অন্বেষণ')। সেই অন্বেষণ, সেই জীবনাসক্তি, সেই বিড়ম্বনার, সেই ব্যর্থ প্রয়াসের ত্রুটিহীন কাব্যরূপায়ণ 'প্রতিমা' সনেটটি। কবির বেদনাহত কণ্ঠে মানবজীবনের সাধ ও আশার, সাধন ও ব্যর্থতার একটি সম্পূর্ণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে:

প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে'।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি,—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে',
পরায়েছি শ্যামসাটি মরকতে বুনি
রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।
প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,

প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন।

প্রমথ চৌধুরী মানবজীবনের এই ট্রাজেডির কবি। কিন্তু সে ট্রাজেডি তাঁকে দুঃখবাদী না করে' আনন্দবাদী করেছে।

তবু একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। একথা সত্য, প্রমথ চৌধুরী সচেতনভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়-উপাসক ও আনন্দবাদী। 'যৌবনে দাও রাজটিকা', 'প্রাণের কথা', 'রূপের কথা', 'ফাল্গুন' প্রভৃতি গদ্যরচনা (প্রবন্ধসংগ্রহ ২) তার পরিচয়স্থল। 'রূপক' 'হাসি ও কান্না', 'মুশকিল-আসান' সনেটে তার সমর্থন পাই। তবু বীরবলী সনেটের অন্তঃপ্রকৃতি বিচারে একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার মধ্যে এমন একটা বিমূর্ত প্রত্যয় নিয়ে চিন্তা করবার প্রবণতা রয়েছে যা পঞ্চেন্দ্রিয়-উপাসনার পথে স্বধর্ম নয়। সনেটগুচ্ছে বুদ্ধির ক্রীড়া, যুক্তির খেলা, মননশীলতার কৌশল যতটা কেন্দ্রে এসে পৌচেছে ততটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সমাহারে রসগভীর হয় নি। রূপের প্রতি তাঁর সচেতন আকর্ষণ থাকলেও বিমূর্ত চিন্তার প্রতি ছিল অন্তরের টান। তাই বীরবলী সনেট ততটা রূপময়, রসময়, গভীর আনন্দবেদনাময় হয়নি যতটা হয়েছে বাঙ্ময়, ব্যঙ্গপূর্ণ ও মননশীল। বীরবলী সনেট আমাদের বুদ্ধিকে যতটা নাড়া দেয়, হৃদয়ানুভূতিকে ততটা নয়। আমরা জানি, রূপের কাজ অনুভূতি সঞ্চার— বুদ্ধিকে দোলা লাগানো নয়। বীরবলী সনেট তাই রূপসৃষ্টির চেয়ে রূপের সমালোচনাই বেশি করেছে। ফলে গদ্যের মতো পদ্যেও প্রমথ চৌধুরী মূলত স্টাইলিস্ট।

৬ | বীরবলী গদ্যরীতি

সাধুভাষা ও চলিত ভাষা, লেখ্যরীতি ও কথ্যরীতি নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক শতাব্দী ধরে চলছে। দ্বন্দ্বটা আসলে সাধু চলিত রীতির দ্বন্দ্ব নয়, এই সত্য আমরা বুঝেও বুঝি না। দ্বন্দ্বটা আসলে নোতুন গদ্যভঙ্গির সাহিত্যরূপ নিয়ে। সাহিত্যিক কথ্যরীতি ও আটপৌরে কথ্যভঙ্গি এক নয়,—এই সত্য সর্বদা স্মরণে থাকে না বলেই ভ্রান্তি ঘটে। ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের কথ্য রূপ মানেই সাহিত্যিক চলিত রীতি নয়।

"গঙ্গার ধারে সেই সুর দিয়ে মিনে-করা বাদলদিন আজও রয়ে গেছে, আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকটাতে" (ছেলেবেলা)—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি আটপৌরে কথ্যরীতি নয়। রসসৃষ্টি ও কবিত্বমাধুর্যে তুলনাহীন এই উক্তি সাহিত্যিক কথ্যরীতি, একে কবিতা বললে ভুল হয় না।

সাহিত্যিক কথ্যভঙ্গি ক্রিয়াপদাশ্রিত—এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পাঠে। সাধুক্রিয়াপদ ব্যবহার করেও জীবনস্মৃতির গদ্যকে কথ্যভঙ্গিম গদ্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা হয় না। "প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে; পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম।" (বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি)—এই গদ্যাংশের কথ্য-ভঙ্গিম রীতি ও প্রাণচঞ্চল বাক্‌পদ্ধতি সাধু ক্রিয়াপদ সত্ত্বেও পাঠককে মুহূর্তমধ্যে গ্রাস করে ফেলে। বারবার পাঠককে সম্বোধন করেও 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্র কথোপকথনের স্পন্দন জাগাতে পারেন নি, জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তা অনায়াসেই পেরেছেন। জীবনস্মৃতি-রচনা ও সবুজপত্র প্রকাশের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক কথ্যরীতির প্রাণশক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন এবং ক্রিয়াপদের পরিমার্জনায় তাঁর উদ্যম পরবর্তীকালে সজীব ছিল।

চলিত বাংলার কথ্যরীতি ও উচ্চারণভঙ্গি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই আগ্রহী ছিলেন ও তা নিয়ে ভেবেছিলেন, তার প্রমাণ 'শব্দতত্ত্ব' বইটি। লিখিত ও কথিত বাংলা ব্যাকরণে প্রভেদ আছে, এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ধ অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণ গড়ে উঠতে পারে না,—এই দুটি কথা রবীন্দ্রনাথ জোরের সঙ্গেই বলেছিলেন। এই গ্রন্থের কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

"সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আচরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়। ·····বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে।— ··

এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে।·········

। মাতাকে (বাংলা ভাষাকে) সংস্কৃত ভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিত প্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিনীবেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।" ['ভাষার ইঙ্গিত,' ১৩১১, শব্দতত্ত্ব]।

বাংলা উচ্চারণরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য—হসন্তপ্রবণতা। শব্দের আদ্যস্বরের উপর ঝোঁক পড়ে, ফলে শব্দান্তের স্বর লুপ্ত হয়, হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি হয়। বাংলা উচ্চারণে স্বরধ্বনির চেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি সংঘাত সৃষ্টি করে আর শব্দ-মধ্যস্থ স্বরধ্বনিগুলির স্পষ্ট উচ্চারণে মন্থর ধ্বনিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। শব্দ-উচ্চারণের এই বৈশিষ্ট্য সুললিত তৎসম শব্দকে ভেঙে দেয়—'নিখিল' হয়ে যায় 'নি-খিল্'। ব্যঞ্জনধ্বনি সংঘাতে শব্দ সঙ্কুচিত হয়ে যায়—'যাইতেছি' হয়ে যায় 'যাচ্ছি', রূপান্তরে 'যাচ্চি'। দীর্ঘ সুললিত ধ্বনিপ্রবাহসমৃদ্ধ বাক্য কতকগুলি বাক্যখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতে বাক্য ও শব্দ সুরবর্জিত হয়ে যায়, একঘেয়েমি দেখা দেয়।

এসব অসুবিধার সমাধানের পথ অনেকেই খুঁজেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর, যোগেশ বিদ্যানিধি, অবনীন্দ্রনাথ খুঁজেছেন, রবীন্দ্রনাথও খুঁজেছেন। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র, ছিন্নপত্র,

গল্পগুচ্ছ ও গদ্যনাটকের সংলাপে রবীন্দ্রনাথ চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে আসছিলেন। সুরবর্জিত মৌখিক ভঙ্গির সঙ্গে ছন্দঃস্পন্দের বিরোধ আছে—এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু সুরেলা কাব্যধর্মী ছন্দঃস্পন্দযুক্ত গদ্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

সবুজপত্র (১৯১৪) সেই মুক্তির প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করেছিল, আর সবুজ-পত্র-সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) সেই ক্ষেত্রের প্রধান পুরুষরূপে দেখা দিয়েছিলেন। ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ, খণ্ড খণ্ড বাক্যাংশ, যুগল ক্রিয়াপদ, শব্দের বিভিন্ন অর্থাভাস, বাক্যের আকস্মিক বিভাগ, বাগ্‌ভণিতি, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও ভাষার গাঢ়বন্ধতা, কথ্য বাংলার ফ্রেজ ও ইডিয়ম, পদবিন্যাসের কথ্যভঙ্গি-সুলভ রীতি—সব-কিছুই প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিতে দেখা গেল। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তা বীরবলী গদ্যরীতি নামে প্রখ্যাত।

প্রমথ চৌধুরী বাংলাভাষাকে কী দিয়েছিলেন? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর, তিনি বাংলা গদ্যকে জীবনীশক্তি দিয়েছেন, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। তিনি বুঝেছিলেন, ভাষা যখন কথ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। স্বামী বিবেকানন্দও তা বুঝেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী সে কথাই জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। গদ্যচর্চা বিবেকানন্দের পরিপূর্ণ মনোযোগ পায় নি, প্রমথ চৌধুরী জীবনের সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ গদ্যচর্চায় আরোপ করেছিলেন। ফলে বিবেকানন্দে যা ইঙ্গিত মাত্র বীরবলে তা ফলবান। সেই কারণে তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় তিনি যেন আমাদের সঙ্গেই ঘরোয়া আলাপ করছেন। লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রেত দায়িত্ব। তাই তিনি কথ্যরীতির সার্বত্রিক অনুশীলনে মন দিয়েছিলেন।

অনুশীলন শব্দটি বীরবলী গদ্যরীতি, চিন্তাপদ্ধতি ও মননের সার্থকতম অভিধা।

অনুশীলিত দেহের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহাকবি কালিদাস বলেছেন যে, সে দেহ মেদচ্ছেদকৃশোদর, প্রগুণ, প্রাণসার, উৎসাহযোগ্য; সে দেহ ভার বর্জন করেছে, সার অর্জন করেছে, তা অদম্য প্রাণশক্তির আধার; সে দেহ পলিমাটির লতাপাতা-খাওয়া হোঁৎকা কাতীর দেহের মতো নয়, তা গিরিচর নাগের দেহের মতো। কালিদাসের এই বর্ণনা অনুশীলিত মনেরও বর্ণনা।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই মনের অধিকারী। তিনি অতি যত্নে তাঁর মনটি তৈরি করেছিলেন, তাই তাঁর মন সমস্ত ভার ঝেড়ে ফেলে লঘু ও সারবান, সরস ও প্রাণসার হয়েছিল। ভট্টবানের ভাষায় প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে বলা যায়, তিনি 'অখিলকলাকলাপলোচন কঠোরমতিঃ নিখিলশাস্ত্রাবগাহনগভীর বুদ্ধিঃ'।

প্রমথ চৌধুরীর অনুশীলিত মনের সার্থক প্রতিরূপ তাঁর গদ্যরীতি। সবুজপত্র মাসিকপত্রের সম্পাদকরূপে তিনি সাহিত্যে নোতুনকে সাদর আহ্বান জানান। বীরবলী গদ্যরীতি সে আহ্বানের মন্ত্রভাষা। এই কাজে তিনি একা নন, একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিকগোষ্ঠীর অধিনায়করূপে তিনি ভাষা ও চিন্তারীতিতে নোতুনকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুনরায় ভট্টবানের ভাষায় তাঁকে বলতে পারি, 'প্রবর্ত্তয়িতা গোষ্ঠীবন্ধানম্'।

বাংলা গদ্যকে প্রমথ চৌধুরী দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। একারণেই তিনি সাহিত্যে কথ্যরীতির সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি নিরলস প্রয়াস করেছিলেন; চলতি রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টির ভূরিভূরি পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তার পক্ষে যুক্তিও দিয়েছিলেন।

এখানে চলতি গদ্যরীতির সমর্থনসূচক তার কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করি।

১. 'লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন তা হলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে।' ('মলাট-সমালোচনা: প্রবন্ধসংগ্রহ ১)

২. আমি বাংলা ভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।...যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়।......ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নইলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে এনো না।' ('কথার কথা', তদেব)

৩. 'একথা নিশ্চিত যে, আমাদের কথায় ও লেখায় যত অধিক অমিল হয়, তত আমরা সেটি অহংকারের এবং গৌরবের বিষয় বলে মনে করি।

সেই বিবাদ ভঞ্জন করবার চেষ্টাটা আমি উচিত কার্য বলে মনে করি। সেই কারণেই এদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজের 'স্থূলহস্তাবলেপ' হতে মাতৃভাষাকে উদ্ধার করবার জন্য আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন করতে বলি, যে পথের দিকে আমাদের সিদ্ধাঙ্গনারা উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছেন।' ('বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে সাধুভাষা', তদেব)

এইসব অভিমত থেকে অনুধাবন করা যায়, প্রমথ চৌধুরী কথ্যভঙ্গিকে সাহিত্যে ঠাঁই দিতে চান, প্রয়োজন মতো বাইরে থেকে শব্দ গ্রহণে তাঁর আপত্তি নেই। এ সব কথাই বিবেকানন্দ এক দশক পূর্বেই বলেছেন 'ভাববার কথা' গ্রন্থে।

সাহিত্যিক কথারীতির ভিত্তি হবে কোন্ উপভাষা ?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন,

'যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কল্‌কেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয়, ত বুদ্ধিমান অবশ্যই কল্‌কেতার ভাষাকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন।' (১৯০০ খৃ, 'ভাববার কথা'য় গৃহীত)

হুবহু একথাই বলেছেন প্রমথ চৌধুরী—

'আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলকাতার মৌখিক ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠবে। তার কারণ, কলকাতা রাজধানীতে বাংলাদেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক বাস করেন। ঐ একটিমাত্র শহরে সমগ্র বাংলাদেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙালি জাতির প্রতিনিধিরা একত্র হযে পরস্পরের কথার আদানপ্রদানে যে নব্যভাষা গড়ে তুলছেন, সে ভাষা সর্বাঙ্গীণ বঙ্গভাষা। ('বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা,' পৌষ ১৩১১ বঙ্গাব্দ, ডিসেম্বর ১৯১২ খৃষ্টাব্দ)।

ভব্য ভাষা ও আটপৌরে ভাষার মধ্যে শেষোক্ত রীতিই আমাদের আশ্রয়, একথা প্রমথ চৌধুরী বারবার বলেছিলেন। দাক্ষণ বঙ্গে, ভাগীরথীর উভয় কূলে, পশ্চিম বঙ্গে—নদীয়ায়, বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশে যে ডায়ালেক্‌ট্ প্রচলিত ছিল, তারই সংস্কৃত রূপ বাংলা সাধু-ভাষা বলে পরিগণিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, "ঐ দক্ষিণদেশি ভাষাই তার আকার ও বিভক্তি নিয়ে সাধুভাষা বলে পরিচিত। অথচ আমি তার বন্ধন থেকে সাহিত্যকে কতকটা পরিমাণে মুক্ত করে এ যুগের

মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে নিয়ে আসবার পক্ষপাতী। এবং আমার মতে, খাস-কলকাত্তাই নয়, কিন্তু কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা অনুসরণ করেই আমাদের চলা কর্তব্য।" (তদেব)

'আধুনিক কলকাতার ভাষা', 'বাঙালি জাতির ভাষা' বলতে তিনি শিক্ষিতসমাজের ভাষাকেই বুঝেছেন। তারই ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যিক কথ্যরীতি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী বারবার ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও কৃষ্ণনগরের প্রশস্তি রচনা করেছেন। এর কারণ কি? ভারতচন্দ্রের ভাষায় যে গাঢবন্ধতা, প্রসাধনক্ষমতা ব গ বৈদগ্ধ্য লক্ষ্য করা যায়, তা সহজলভ্য নয়। মৌখিক ভঙ্গি ও আটপৌরে শব্দের অকুণ্ঠ ব্যবহারকে ছাপিয়ে উঠেছে ঐ বাক্‌পদ্ধতি—তা বিদগ্ধ, অভিজাত, তির্যক। তা আসলে অষ্টাদশ শতকের শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের ভাষা। প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষা আসলে বিশ শতকের প্রথমার্ধে শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের ভাষা। তা মোটেই চলিত ভাষা নয়, আটপৌরে অনভিজাত অশিক্ষিত লোকব্যবহারের ভাষা নয়, তা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ বিশ্রম্ভালাপ—তার অন্তর্ধানে বুদ্ধিদীপ্ত প্রসাধননিপুণ অভিজাত শিল্পীমন ক্রিয়াশীল। ভাবতচন্দ্রেব হীবা মালিনী বিদেশি রাজপুত্র সুন্দরকে বলেছিল,

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে,
কথায় তাহারা সব মনেব গাঁট কাটে।

যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও প্রসাধিত ভাষায় মনের গাট কাটা যায়, তার ওপর ভারতচন্দ্র রায় ও প্রমথ চৌধুরীর অনায়াসদখল ছিল। তাতে আছে চিন্তা ও প্রকাশ ভঙ্গির মারপ্যাঁচ, তির্যক ভঙ্গি, শাণিত বক্র উক্তি। তার জন্য প্রমথ চৌধুরী ব্যবহার করেছেন অর্থাভাসযুক্ত বাক্যাংশ ও শব্দ, আশ্রয় নিয়েছেন বিরোধাভাস (প্যারাডক্স) ও বিষমের (এপিগ্রাম), শ্লেষ (পান্) ও ব্যঙ্গের (স্যাটায়ার), বক্রোক্তি ও ব্যাজোক্তির (আয়রনি)। এ সবই বিদগ্ধ ভাষাশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চলিত বাংলাভাষার সাহিত্যরূপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য নয়, সে-কারণেই পরবর্তীকালে বীরবলী রীতির অন্ধ অনুসরণ হয় নি। তবে তিনিই প্রথম চলিত রীতিকে সাহিত্যের আম-দরবারে রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বীরবলী গদ্যরীতি সম্পর্কে পূর্বেকার ভাবালুতাপূর্ণ উচ্ছ্বাস এখন তিরোহিত। তার ফলে এর আন্তর মূল্য সম্পর্কে আমরা ক্রমশই মোহমুক্ত

ও সচেতন হয়ে উঠছি। প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন জীবনী-শক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ, কিন্তু কবিত্বশক্তির অভাববশত গদ্যকে স্থায়ী শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ কথ্য-রীতির গদ্যে যে শিল্পসাফল্য লাভ করেছেন, প্রমথ চৌধুরীর তা অনায়ত্ত ছিল। তাই পরবর্তী লেখকদের ক্ষেত্রে—যেমন, গদ্যশিল্পী সুধীন্দ্রনাথের উপর,—তাঁর প্রভাব বিশেষ নেই। আবার ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে গদ্যরীতির যে-ঋণ স্বীকার করেন, প্রমথ চৌধুরীর কাছে তা করেন নি। কথ্যরীতির নিত্যসঙ্গী উচ্চাঙ্গের শিল্পী-স্বভাব, অলংকার-প্রযুক্তি তাব সার্থক বিকল্প নয়,—এই সত্যটি গদ্যশিল্পী প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে সত্যতর বলে মনে হয়। বাক্‌চাতুরী, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, শাণিত বক্রোক্তি গদ্যেব মৌল শিল্পলক্ষণ নয়—একথা অবশ্যস্বীকার্য। বীরবলী বচনায় শ্লেষ-যমক, বিষম-বিরোধাভাস, ব্যাজোক্তি-অনুপ্রাসের প্রাচুর্য গদ্যকে সুখপাঠ্য করেছে বটে, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে সেই গাম্ভীর্য ও কমনীয়তা, লাবণ্য ও দার্ঢ্য, যা উৎকৃষ্ট গদ্যের তর্কাতীত লক্ষণ। কিন্তু ভাষার বহিরঙ্গ প্রসাধনে প্রমথ চৌধুরীর নৈপুণ্য অবশ্যস্বীকার্য। সংহত পরিপাটি ক্ষিপ্র লঘু তীক্ষ্ণ পরিচ্ছিন্ন মিতভাষী শাণিত গদ্যরচনায় তিনিই আধুনিক বাঙালিকে দীক্ষিত করেছিলেন।

মিতভাষিতা ও হীরককাঠিন্য বীরবলী গদ্যরীতি ও রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ভারতে মিতভাষণের যে আদর ছিল তা বুঝা যায় এই থেকে যে, বৈয়াকরণ তাঁর সূত্রে একটি স্বরবর্ণ কমাতে পারলে পুত্রলাভের আনন্দ পেতেন। প্রমথ চৌধুরী মিতভাষণের এই ঐতিহ্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। অল্প কথায় অনেক ভাবপ্রকাশের দুরূহ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। আমাদের অতিকথন ও অতিলেখনের দেশে তাঁর এই আত্মসংযম ও মিতভাষণ বিরল ব্যতিক্রম। তাঁর কথা শিরোধার্য: 'অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তা হলে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হতে ভ্রষ্ট হতুম না।' (বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ। বীরবলের হালখাতা। প্রবন্ধসংগ্রহ ১)

হীরা মালিনীর পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতচন্দ্র বলেছিলেন, 'কথাতে

হীরার ধার হীরা তার নাম'। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতিতে আছে হীরক-কাঠিন্য, হীরার ধার ও ঝলক। বস্তুত এটাই তাঁর অভীষ্ট, 'ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়।' শ্লেষ (পান্), বিষম (এপিগ্রাম) ও বিরোধাভাস (প্যারাডক্স) অলংকার ব্যবহারের দ্বারা প্রমথ চৌধুরী ভাষায় এনেছিলেন হীরার ধার আর ঝলক। দুঃখের কথা, অনেক সময়েই তা পর্যবসিত হয়েছে চাতুরী ও চটকে।

তাঁর গদ্যরীতিতে আছে সংহতি ও প্রসাদগুণ (ব্রেভিটি ও ক্ল্যারিটি), তাঁর মন ছিল স্বচ্ছ, বুদ্ধিদীপ্ত, মনন-আলোকিত। সাবেক বা হাল আমলের কোনো ঝাঁকুনি বা কুয়াশা তাঁর মনকে ঘোলাটে করতে পারে নি। তাই প্রসাদগুণ (ক্ল্যারিটি) বীরবলী ভাষার অন্যতম প্রধান গুণ।

স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্য, বক্রকটাক্ষসমন্বিত জীবনদৃষ্টি, পরিহাসপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণ মনন ও অসাধারণ রসবোধ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছিলেন। স্থূলবিচারে বলা যায় ১৮৯০ থেকে ১৯৪০ খৃ—এই অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে তাঁর সাহিত্যজীবন বিধৃত। তাঁর গদ্যরচনার বিস্তার পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু কাব্যচর্চার কাল মাত্র ছয় বৎসর,—চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সের মধ্যে (১৯১১-১৬ খৃ)—৬টিমাত্র কাব্যগ্রন্থ তিনি লিখেছেন, 'সনেট পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) ও 'পদ-চারণ' (১৯১৯)। কাব্যভাষায় তাঁর গদ্যভাষার সংহতি, কাঠিন্য, বক্রোক্তি ও শ্লেষালংকার ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য অনায়াসলক্ষণীয়। গদ্যরচনায় যে বীরবলী কটাক্ষ ও তির্যক দৃষ্টি, তা কবিতায় উপস্থিত। তাঁর সনেট থেকে কয়েকটি চরণ উদ্ধার করছি—এ থেকেই তাঁর কাব্যভাষা ও গদ্যভাষার সাদৃশ্য অনুধাবন করা যায়।

১. ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
   শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন। (সনেট)

২. কবিতায় যত সব লাল-নীল ফুল,
   মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
   তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
   মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই! (আত্মকথা)

৩. সোহাগে গলিয়া তুমি হও বা আতর
   গুল্ফাসনে বসে কর বেগম কাতর। (গোলাপ)

৪. বিশ্বসনে দিন রাত শুধু বোঝাপড়া
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া। (বিশ্বকোষ)

৫. আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে 'লা-আল্লা-ইলাল্লা'
আকাশেতে শুনি বাণী 'মুশ্‌কিল-আশান'। (মুশকিল-আশান)

৬. প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন!
তার লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন,
জোর-করা ভাব, আর ধরা-করা ভাষা! (উপদেশ)

কিন্তু গদ্য-পদ্যের নির্বিরোধ সাধনে প্রমথ চৌধুরী সচেতন প্রয়াস করেছিলেন বলে মনে হয় না।

বীরবলী গদ্যরীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় গ্রহণের পূর্বে প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-রচনার সম্পূর্ণ তালিকাটি স্মরণ করি: তেল-নুন-লকড়ি (১৯০৬), চার ইয়ারি কথা (১৯১৬), বীরবলের হালখাতা (১৯১৭), নানা কথা (১৯১৯), আহুতি (১৯১৯), আমাদের শিক্ষা (১৯২০), দু-ইয়ারকি (১৯২০), বীরবলের টিপ্পনী (১৯২১), রায়তের কথা (১৯২০), নানা চর্চা (১৯৩২), নীললোহিত, নীললোহিতের আদিপ্রেম (১৯৩৪), ঘরে বাইরে (১৯৩৬), ঘোষালের ত্রিকথা (১৯৩৭), অনুকথা সপ্তক (১৯৩৯), প্রাচীন হিন্দুস্থান (১৯৪০), গল্পসংগ্রহ (১৯৪১), হিন্দু সংগীত (১৯৪৫), আত্মকথা (১৯৪৬), মৃত্যুর পর প্রকাশিত—প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড (১৯৫২), দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৫৪)। [শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলিত 'প্রমথ চৌধুরীর গ্রন্থসূচী']

এখানে সাতটি গল্পগ্রন্থের উল্লেখ আছে, বাকি প্রবন্ধ-গ্রন্থ। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির আলোচনায় গল্পগ্রন্থ ও প্রবন্ধগ্রন্থ একসঙ্গেই বিচার্য, কারণ তাঁর গদ্যরীতিকে কথা-গদ্য ও প্রবন্ধ-গদ্যে বিভক্ত করা যায় না, একই গদ্যরীতি সর্বত্র ব্যবহৃত। এবার কালানুক্রমিক নমুনা থেকে বীরবলী গদ্যের সাক্ষাৎ পরিচয় গ্রহণ করা যাক্।

[১] যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশি রকমে অভ্যাস করেছি, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশি নিয়মে চর্চা করতে হবে।

আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙালি হয়ে। ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলোমেলো ভাবেরই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দল বেঁধে বিধিব্যবস্থাপূর্বক সাহেব হই নি। প্রতিজনেই নিজের খুশি কিংবা সুবিধা অনুসারে নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গবঙ্গ-সমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশি আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষেরা পহিলা সমিতি করি নি, এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা সমিতি পর্যন্ত গঠন করেছি। [তেল-নুন লকড়ি, 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১২ মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত, ১৯০৬]

এখানে শ্লেষ (পান্) ও বিরোধাভাস (অ্যান্টিথিসিস ও প্যারাডক্স) অলংকারের ব্যবহার অনায়াসলক্ষণীয়। পদবিন্যাসে সচেতন বিপর্যয়সাধনের কৌশলটিও লক্ষণীয়। বাক্যগুলি কাটা-কাটা, সুরবর্জিত, পরস্পর-বিযুক্ত, কথ্যভাষার শব্দের পাশেই তদ্ভব-তৎসম শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে, কথ্য ইডিয়মের পাশেই তৎসম বাক্যাংশ বসানো হয়েছে। 'স্বাভাবিক ঢিলেমি, 'চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব', 'ফিরে ধরবার ইচ্ছেয়'— বাক্যাংশগুলি এর পরিচায়ক। এই রচনার ভিত্তি কথ্যভাষা,—এখনে তারই শিষ্ট মার্জিত তির্যক উপস্থাপনা। 'পহিলা-সমিতি' ও 'মহিলা-সমিতি'— বিরোধাভাসযুক্ত শব্দবন্ধ দুটি লক্ষণীয়। 'বিদেশীয়তা ও 'স্বদেশীয়তা'—এ দুটি শব্দবন্ধও বিরোধাভাস-অলংকারের প্রযোগস্থল। আগাগোড়া বিদ্রূপ ও কৌতুকের প্রচ্ছন্ন সুর সতর্ক পাঠকশ্রুতিতে পৌঁছয়।

[২] আমি শত চেষ্টা করেও 'বিনী'র মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারিনি, তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফূর্তি হত, তার আমোদ চড়ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত; আমার নাক ধরে টানত, চুল টানত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে দেখাত। [চার-ইয়ারি-কথা, ১৯১৬]

খাঁটি বাংলা ফ্রেজ, ইডিয়াম ও স্ল্যাং-এর সঙ্গেই তৎসম শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, তার ফলে এক ধরণের বিরোধাভাস ও কৌতুক-পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে।

[৩] তোমাদের আগে ভালবাসা পরে বিবাহ, আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালবাসা। আমাদের বিবাহ 'হয়', তোমরা বিবাহ 'কর'। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু 'ভূ', তোমাদের ভাষার 'কৃ'। তোমাদের রমণী-'দের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকারশাস্ত্রে। [আমরা ও তোমরা, 'ভারতী' শ্রাবণ ১৩০৯, বীরবলের হালখাতা, ১৯১৭]

অ্যান্টি-থিসিস ও প্যারাডক্সের ছড়াছড়ি এই গদ্যাংশে। বস্তুত বিরোধাভাস অলংকারের উপর লেখাটি দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত রচনাটি জ্যামিতিক সূত্রাকারে নিবদ্ধ, বাক্যগুলি কাটাকাটা, পরস্পর-বিযুক্ত; তর্কবিদ্যার স্বল্পাক্ষর গাঢ়ার্থক প্রস্তাবের চেহারা নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু এখানেই এর দুর্বলতা। তুচ্ছ ক্ষীণ বিষয়বস্তুর উপর ভাষার চটককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, ফলে রচনা বাক্‌চাতুরিতে পর্যবসিত হয়েছে। ক্ষিপ্র বাকচাতুর্য এখানে অগভীর রসিকতায় পরিণত হয়েছে। শস্তা মনোরঞ্জন চেষ্টা অত্যন্ত বাস্তব ও গভীর চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছে বলেই না প্রমথ চৌধুরী লিখতে পেরেছেন অগভীর কথা—'আমাদের বিবাহ হয়, তোমরা বিবাহ কর'। ভাষাতেও এই দুর্বলতা প্রকট।

[৪] জর্মান বৈজ্ঞানিক হেকেল এবং জর্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এসব দার্শনিক হাত সাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না তার কারণ, সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহমনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শনবিজ্ঞানের মনগড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস

চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়। [প্রাণের কথা, সবুজপত্র, শ্রাবণ ১৩২৪, নানা-কথা ১৯১৯]

বীরবলী গদ্যরীতি আটপৌরে সংলাপ ও গদ্যরীতি থেকে যে ক্রমশই দূরে সরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম শিষ্ট অতি-মার্জিত উচ্চাঙ্গের ভাষা-সংলাপে পরিণত হয়েছে, তার প্রমাণ এই গদ্যাংশ। প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌ভণিতি, বৈদগ্ধ্য, পরিহাসকুশলতা, বক্র কটাক্ষ ও তির্যক প্রকাশভঙ্গি মিলে এই ভাষারীতিকে সর্বজনের পক্ষে দুরূহগম্য করে তুলেছে। ব্যাজোক্তি ও বক্রোক্তি গদ্যরীতির শেষ কথা নয়, অলংকার-প্রযুক্তি কথ্যরীতির নিত্য-সঙ্গী উচ্চাঙ্গের শিল্পীস্বভাবের সার্থক বিকল্প নয়, বাক্‌চাতুরী ও চটক ভাষার দার্ঢ্য ও লাবণ্যের উপযুক্ত বিকল্প নয়,—এই সত্য এখানে প্রতিভাত।

[৫] আমি বাইরের দিক তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশযোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চার-দিক এমন নির্জন এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল, মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্ব-চরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারপর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে সম্মুখে যা পড়ে আছে, তা একটি—বালির নয়, পোড়মাটির পাহাড়,—সে মাটি পাতখোলার মত, তার গায়ে একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্বে যে ছিল, তার অসংখ্য এবং অপর্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতোদুর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথাও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথাও বা তা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে, আর সে ইট এত লাল যে, দেখলে মনে হয়, টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ; কিন্তু তার একটিও পাতা নেই, সব নেড়া সব শুক্‌নো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা দু একটি এক ধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইট কাঠ, মাটি, আকাশের সর্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেন না, আমারই গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগল। [আহুতি, ১৯১৯]

গল্পের মধ্যে প্রকৃতিচিত্রাঙ্কনে প্রমথ চৌধুরী এখানে যে-রীতি অবলম্বন করেছেন, তা আমাদের সমস্ত পূর্ব ধারণাকে বিপর্যস্ত করে। নির্জন নিস্তব্ধ প্রাণহীন রাঙা পোড়ামাটির রাজ্যের ভৌতিক শিহরণ সৃষ্টিতে তিনি কৃতকার্য হয়েছেন নিজস্ব পথে। বর্ণনাভঙ্গির নির্বিকার ছাড়া-ছাড়া ভাব ও কথ্যভাষার শব্দব্যবহার বিশেষ লক্ষণীয়।

[৬] ভট্টাচার্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয়, আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয় ; কিন্তু গোস্বামি-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা-ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।......

সমাজে আগে হয় বিয়ে পরে সন্তান, তারপর মৃত্যু ; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তারপর বিয়ে, নয় মৃত্যু। এককথায় মানুষের জীবনে যা হয়, তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত ; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই। [ফরমায়েসি গল্প, আহুতি, ১৯১৯]

বিষম-অলংকারের (এপিগ্রাম) উদাহরণরূপে এই অংশটি গ্রহণ করা যায়। তীক্ষ্ণাগ্র সংক্ষিপ্ত তির্যক জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক এইসব এপিগ্রাম। এই গদ্যরীতি, সন্দেহ নেই, সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতাকে ছাড়িয়ে যায়।

[৭] লাস্ট ক্লাসের গিরিশ পণ্ডিত আমাদের নীতি উপদেশ দিতেন। তাঁর একটি উপদেশ আমার আজও মনে আছে। তিনি বলেছিলেন যে, মাছমাংস কখনো খেয়ো না, যেমন আমি খাই নে। তবে মাছের ও মাংসের ঝোল খেয়ো যেমন আমি খাই ; আর ঝোলের সঙ্গে যদি দু-এক টুকরো মাছ কি মাংস আসে, তা খেতে পারো। যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও—এই বলে'।......

আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু, আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।......যার মুখের ভাষা ভাল, সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণ-নাগরিকরা জানতেন, এরই নাম বাক্‌চাতুরী।......এজন্য আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।......সেকালে যারা ছোকরা ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত হয়েছেন—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আর আমি। আমরা দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক। আমাদের দুজনেরই লেখায় আর গুণের অভাব থাক—রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট রচনার নাম হাসির গান

আর বীরবলের কথা কান্নার বস্তু নয়। ['রূপ ও রীতি' পত্রিকায় (১৯৪০) প্রথম প্রকাশিত, 'আত্মকথা' ১৯৪৬]

প্রমথ চৌধুরীর ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য এখানে নিজেই কবুল করেছেন—ইচ্ছে মতো ভাষাকে বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে ব্যবহার করেছেন। বীরবলী গদ্য-রীতির দুটি প্রধান গুণ—বাকচাতুরী বা স্থিতিস্থাপকতা আর রসিকতা—এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

তাঁর প্রথম গদ্যরচনা স্বনামে প্রকাশিত ও বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় লেখা—'জয়দেব' ('ভারতী ও বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭/১৮৯০), 'আদিম মানব' ও 'ফুলদানী' ('সাহিত্য', ১২৯৮/১৮৯১)। বীরবল ছদ্মনামে লিখতে শুরু করেন 'ভারতী'তে (১৩০৯ বৈশাখ/১৯০২)—কথ্যভাষাশ্রয়ী বীরবলী রীতির এখানেই রীতিমত সূত্রপাত হয়। চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি বীরবলী গদ্যরীতির চর্চা করেছিলেন এবং বাংলা গদ্যকে দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। লেখকের সঙ্গে পাঠকের দূরত্ব নিশ্চিহ্ন করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর অভিপ্রেত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তিনি সমস্ত জীবন ধরে পালন করেছেন। তাতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নি, কিন্তু তাতে প্রমথ চৌধুরীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ঋণের পরিমাণ কমে না।

॥ ৩ ॥

প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসি গদ্যের অনুশীলন করি। সাহিত্যে আনাড়িপনা, বাক্যরচনায় ঢিলেমি, শব্দপ্রয়োগে শৈথিল্য তিনি সহ্য করতে চান নি। তিনি বাঙালি লেখককে ইংরেজি গদ্যরীতি বর্জন ও ফরাসি গদ্যরীতি গ্রহণের উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, 'সঙ্গীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না, এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরেজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ।......ইংরেজি সাহিত্যের amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা-যেমন করে যা-হোক-একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনোরূপ আয়াস নেই, কোনোরূপ আত্মসংযম নেই। ফরাসি সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুই-ই লেখকদের সংযম

অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়।' ('ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়', সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩। নানা কথা। প্রবন্ধসংগ্রহ ১)

ফরাসি সাহিত্য লেখককে লঘু ও তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছিন্ন ও পরিপাটী, সংযত ও ভদ্র ভাষারচনায় উদ্বুদ্ধ করে, এই হ'ল প্রমথ চৌধুরীর অভিমত। 'এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস, বাংলার সঙ্গে ফরাসি ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলতঃ এক, এবং বিদেশি শব্দে তা ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফুর্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ, জর্মানের ন্যায় স্থূলকায় গুরুভার শ্লীপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাষ্টারপিস্ বলে গণ্য হত।' (তদেব)

ফরাসি সাহিত্য ও গদ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনায় প্রমথ চৌধুরীর যে উদ্যম ও উৎসাহ, তা থেকে তাঁর মানসিক প্রবণতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ফরাসি গদ্যের যে-সব গুণ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হ'ল—সারল্য, ঐক্যসম্পদ, স্বচ্ছতা ও সংযম (simplicity, unity, clarity, restraint)। আমরা জানি ভোলতেয়র্-এর হাতে ফরাসি গদ্য লঘু ও তীক্ষ্ণ, চোস্ত ও সাফ্ হয়ে ওঠে। উগো, ফ্লোবেয়র, মোপাসাঁ ও দোদে-র হাতে ফরাসি গদ্য লাবণ্য, কমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা ও সাবলীলতা-গুণ লাভ করে।

ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলকে বলে প্রভাঁস। এই দক্ষিণ ভূমি ফ্রান্সকে দিয়েছে অনেক কবি ও বাক্শিল্পী। তাঁদের অন্যতম আলফঁস্ দোদে (১৮৪০-৯৭)। দোদে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকথা মেলা লিখেছেন। সাহিত্য-জীবনের সূচনায় পারীর সংবাদপত্রের জন্য রচিত 'আমার জলযন্ত্রের চিঠি' Lettres de mon Moulin (Letters from my Windmill, 1869) ও Tartarain de Tarascon (1872) গ্রন্থদুটিতে তিনি আপন দেশের কথা বলেছেন। এই লেখায়, বিশেষত 'জলযন্ত্রের চিঠি'তে ভাষার যে কমনীয়তা, লাবণ্য, মাধুর্য, আনন্দ ও বেদনা ধরা পড়েছে, তা তুলনাহীন।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষ্ণনগরের অধিবাসী প্রমথ চৌধুরী যখন কৃষ্ণনগর, নদীয়া ও কবি ভারতচন্দ্রের কথা বলেন তখন তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত

করেন। দোদে-ও তা'ই করেছিলেন, প্রভাঁস-অঞ্চলের কথা যখন লেখেন তখন তিনি সবচেয়ে সুখী। বীরবলী প্রবন্ধ ও 'আত্মকথা'য় যেমন আনন্দ বেদনা লাবণ্য মাধুর্য ব্যক্ত, দোদে-র 'জলযন্ত্রের চিঠি'তে তেমনি ব্যক্ত। ব্যঙ্গপ্রধান, অথচ প্রয়োজন ঘটলে যা বেদনায় সজল, আনন্দে রঙীন হতে পারে, গদ্যরীতির উপর দোদে-র ছিল সচ্ছন্দ অধিকার। প্রভাঁস-অঞ্চলের নানা রসালো কাহিনী পাই 'জলযন্ত্রের চিঠি'তে (Letters de mon Moulin'), আর দ'থ্যে ফরাসিদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাশার ছবি পাই Tartarin de Tarascon গ্রন্থে। এই ধরনের বার্লেস্ক-জাতীয় আধা-গম্ভীর আধা-ব্যঙ্গ-মেশানো ভঙ্গিতে সযত্ন চয়িত শাণিত বাক্যাংশ ও শব্দের ছিটা-গুলিতে তিনি প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করে ফেলতেন। ব্যঙ্গপ্রধান আপাতগম্ভীর রচনার উপযোগী আয়ুধ দোদে-র ছিল। এপিগ্রাম (বিষম), প্যারাডক্স (বিরোধাভাস), পান্ (শ্লেষ), আয়রনি (বক্রোক্তি ও ব্যাজোক্তি) দোদে ব্যবহার করেছেন অনায়াসনৈপুণ্যে।

প্রমথ চৌধুরী দোদে-র গদ্যরীতি, বাক্‌পদ্ধতি, কথনকারু ও জীবনদর্শন দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। সে-কারণেই বীরবলী গদ্যরীতি ও দোদে-র গদ্যরীতির মধ্যে সাদৃশ্য আবিষ্কার দুরূহ নয় বলেই আমার মনে হয়। বীরবলী প্রবন্ধ, গল্প ও স্মৃতিকথা এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রমথ চৌধুরী যেমন ন্যাকামিতরা জোলো রোমাণ্টিকতাকে গদ্যে পদ্যে বিদ্রূপ করেছেন, দোদে-ও তেমনি সেকালের রোমাণ্টিক স্বাধীনচেতা বড় বড় আদর্শে ভরা অথচ ভীরু বোকা টাইপের কবিদের ব্যঙ্গকষাঘাত করেছেন। উগোর বিখ্যাত উপন্যাসের (Notre Dame de Paris, 1831) একটি চরিত্র—কবি ম'সিঅ পিয়ের গ্র্যাগর-এর প্রতি উদ্দিষ্ট একটি চিঠিতে (Le chevre de M. Seguin, 'মসিঅ সগ্যাঁর ছাগল' কাহিনী, Letter de mon Moulin গ্রন্থভুক্ত) দোদে এই শ্রেণীর ন্যাকাবোকা কবিদের ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন। এখানে ছাগল-কাহিনীর সূচনাংশ উদ্ধার করে তার আক্ষরিক অনুবাদ করে দিচ্ছি। বীরবলী রচনা-রীতি ও বিশিষ্ট ভঙ্গির সঙ্গে এর মিল সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

La Chevre de M. Seguin

A M. Pierre Gringoire, poete lyrique a Paris. Tu seras bien toujours le meme, non pauxte Gringoire !

Comment ! on t' offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as l'aplomb de refuser...... Mais regerde-toi, malheureux garcon ! Regarde ce pourpoint troue, ces chausses en deroute, ectte face maigre qui crie la faim.

Voila pourtant on t'a conduit la passion des belles rimes ! Voila ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du sire Apollo......Est-ce qu n'as pas honte, a la fin ?

Fais-toi done chroniqueu, imbecile ! fais-toi chroniqueur ! Tu gagneras de beaux nobles a la rose, tu auras ton couvert chez Brebant, et tu pourras re montrer les jours de premiere avec une plume neuve a ta barrette......

Non ? Tu ne veux pas ? Tu pretends rester libre a ta guise jusqu'au bout......Eh bien ecoute un peu l'histoite de la chevre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne a vouloir vivre libre.

॥ মঁসিঅ সগ্যার ছাগল ॥

॥ পারীর গীতিকবি মঁসিঅ পিয়ের গ্র্যাগর-এর উদ্দেশে ॥

বেচারী গ্র্যাগর, তুমি চিরকাল একই রয়ে গেলে।

কি ! পারীর একটা ভালো সংবাদপত্রে রিপোর্টারের কাজ তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, আর তুমি সেই কাজ প্রত্যাখ্যান করলে !......কেন, নিজের দিকে তাকাও, বেচারী আমার ! তোমার আঙরাখার ছেঁদাগুলি দেখ, তোমার মোজার সুতোগুলি দেখ। তোমার সারা মুখে ক্ষুধার ছাপ পড়েছে, তা দেখ !

হ্যাঁ, কবিতা লেখার নেশা তোমাকে এইসব দিয়েছে ! দশটি বছর দেবরাজ আপোলোর অনুচরবৃন্দের বিশ্বস্ত সেবা করে এই তোমার পুরস্কার !...

তুমি কি লজ্জিত নও ? চলে এসো, বাছা ;

যাও, বোকারাম, রিপোর্টার হও গে যাও ! রিপোর্টার হলে কী হবে !

তুমি অনেক টাকা রোজগার করবে, ব্রাবাঁ-তে (নামকরা রেস্তোঁরা) খেতে পারবে, আর প্রথম রজনীতে (নাচের আসরে) টুপিতে নোতুন পালক গুঁজে নিজেকে দেখাতে পারবে। . .

না ? তুমি তা করবে না ? তোমার ইচ্ছেমত যা খুশি করার স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চাও ? বেশ, তাহলে মসিও সগ্যাঁর ছাগলের গল্পটি শোনো। স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকতে চাইলে শেষ পর্যন্ত কী ঘটে, তা এই গল্পে দেখতে পাবে।'

এই অনুবাদে দোদে-র ব্যঙ্গবিদ্রূপ নৈপুণ্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। বাক্‌পদ্ধতি ও অলংকার প্রয়োগকৌশলের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি দোদে-র গদ্যরীতির সহযাত্রী, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

প্রমথ চৌধুরী আমাদের জানিয়েছেন, গদ্যরচনাও আর্ট, তা যত্নসাধ্য, সাধনাসাপেক্ষ। তিনি বুঝেছিলেন ভাষা যখন গদ্যরীতির সঙ্গে যোগ হারায়, তখন আর তাতে জীবনের স্পন্দন অবশিষ্ট থাকে না। বাংলা গদ্যকে তিনি দিয়েছিলেন জীবনীশক্তি, যা কথ্যরীতির অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। ফরাসি গদ্যে এই জীবনীশক্তির প্রাচুর্য দেখেই প্রমথ চৌধুরী সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সে-দিক থেকে বিচার করলে স্বীকার করতে হয় বীরবলের প্রয়াস বিফল হয় নি।

আনাতোল ফ্রাঁসের গদ্যরীতির প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর এক সতীর্থ লিখেছিলেন, Si le crystal pouvait parler, il parlerait parlerait ains.—অর্থাৎ, স্ফটিক যদি কথা কইতে পারত, তবে সে এমনি ভঙ্গিতেই কথা কইত। ভাষার এই স্ফটিক-স্বচ্ছতা গদ্যশিল্পীর শ্রেষ্ঠ গুণ। গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড, লোকসাহিত্য রাজাপ্রজা, সমূহ, সমাজ, সাহিত্য, জীবনস্মৃতি, সাহিত্যের পথে, কালান্তর প্রভৃতি গ্রন্থের রবীন্দ্র-গদ্যে এই স্ফটিক-স্বচ্ছতা লক্ষ্য করা যায়, অবনীন্দ্র গদ্যেও তা দেখা যায়। বীরবলী গদ্যে স্বচ্ছতাগুণ, দুঃখের বিষয়, প্রায়শই অন্য গুণ বা অবগুণে ঢাকা পড়ে গেছে, লেখক-মন ও পাঠক-মনের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করেছে বাক্‌চাতুরী ও চটক। ফলে তা চলতি বাংলা গদ্যের প্রবাহ থেকে দূরে সরে এক গণ্ডীবদ্ধ অভিজাত বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মার্জিত ভাষায় পরিণত হয়েছে।

৭ | বীরবলী প্রবন্ধরীতি

'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তিনি কেবল 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করেন নি, সবুজপত্রীদের একটি গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। এই গোষ্ঠীর লেখকদের লেখায় একটি নোতুন যুগের আভাস পাওয়া গেল। চিন্তায়, বাচনে, প্রকাশভঙ্গিতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় একটি নোতুন মনের পরিচয় প্রকাশ পেল। কী উদ্দেশ্য নিয়ে 'সবুজপত্রে'র প্রতিষ্ঠা, তা প্রমথ চৌধুরী একাধিক-বার আলোচনা করেছেন। আমাদের সমাজে ও সংসারে যে জাড্য, স্থবিরতা ও অকালবৃদ্ধতা পাকাপোক্ত আসন নিয়ে বসেছে, তার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, আমাদের সমাজে মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা। আর এ যৌবন আসলে ইউরোপের বেগবান প্রাণচঞ্চল যুযুধান মনের যৌবন। সত্যেন্দ্রনাথের "যৌবনে দাও রাজটিকা" কবিতাটিকে প্রমথ চৌধুরী এ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। নির্বিশেষে সংস্কৃতিসাধনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তমান বিশ্বের চিন্তাপ্রবাহে অবগাহন না করলে মনের মুক্তি ঘটে না এবং মানসিক জাড্য ও তামসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, এ কথা প্রমথ চৌধুরী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন যৌবন মানবধর্ম, তাকে অস্বীকার করার মত মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবন আর জীবনে তার প্রয়োগ ঘটেছে ইউরোপে; এটি প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের আলোয় তিনি বাঙালি-মনকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্য-সাধনাকে এই আখ্যায় ভূষিত করলে অন্যায় হবে না যে, তা মানসিক যৌবনের সমর্থনে রচিত। খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন, "প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে

জড় জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস। এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।" ('যৌবনে দাও রাজটিকা'—সবুজপত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

তাই এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে, প্রমথ চৌধুরী পুরনোর বিপক্ষে ও নোতুনের পক্ষে, মানসিক বার্ধক্যের বিপক্ষে ও যৌবনের পক্ষে ছিলেন। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে মনোভঙ্গীর দিক থেকে তিনি সর্বাংশ স্বতন্ত্র ছিলেন, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই। প্রমথনাথ এই নোতুন চিন্তার বাহন যে গদ্যকে করেছিলেন, তাও নোতুন, যা 'বীরবলী গদ্য' আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। কথ্যভাষাশ্রয়ী বীরবলী গদ্যের যে কটি প্রধান লক্ষণ, তা এই মানস-প্রসূত: যুক্তিশৃঙ্খলা-প্রবণতা, বাক্‌সংযম, দীর্ঘ বাক্যের অনুপস্থিতি, হ্রস্ব বাক্যের প্রাধান্য, ক্রিয়াপদের লঘুতা, প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, যথাযথতা, ব্যঙ্গপ্রবণতা এবং তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্যের বহুল-প্রয়োগ। জাড্যলেশহীন তারুণ্যের সাধনাতেই বাংলা সাহিত্যের মুক্তি, এই বিশ্বাসেই তিনি বলেছিলেন, "এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারি, তবেই তা সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।"

প্রমথ চৌধুরীর এই আশা ব্যর্থ হয় নি, বর্তমান বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যই তার প্রমাণ।

॥ ২ ॥

বাংলা প্রবন্ধরীতি প্রমথ চৌধুরীতে এসে নোতুন পথে যাত্রা করল, এ কথা স্বীকার্য। প্রাক্-বীরবলী ও বীরবলোত্তর প্রবন্ধরীতিতে একটি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-বীরবলী যুগের বাংলা প্রবন্ধে wisdom-এরই প্রাধান্য, বীরবল-যুগে wisdom in a smiling mood-এরই সমাদর। প্রাক্-বীরবলী যুগের প্রবন্ধরীতিকে যদি কোনো নাম দিতে হয়, তা হলে বলি, তা বঙ্কিমী-প্রবন্ধরীতি। এই রীতির পিছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তার মূল লক্ষণ হল: সমষ্টিচেতনা, কল্যাণমুখিতা, আদর্শবাদিতা এবং অনিবার্যভাবেই ভাবোচ্ছ্বাস। আর বীরবলী প্রবন্ধরীতির পিছনে যে মানসিকতা বর্তমান, তার মূল লক্ষণগুলি এর বিপরীত: ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বমানবিকতা, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা বা স্যানিটি এবং ভাবালুতামুক্তি। এর সঙ্গে এসেছে রসিকতা ও ব্যঙ্গপ্রবণতা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মননশীলতা, নিবিড় ঐহিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এক কথায়, তা শিক্ষিত মানসের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিযজ্ঞে নিয়োজিত। বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতিতে প্রবন্ধকারের ব্যক্তিমানসটিই প্রাধান্য লাভ করে নি, সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে সমাজ ও স্বদেশ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত মনোভঙ্গী। আর বীরবলী প্রবন্ধরীতিতে ও পরবর্তী কালের প্রবন্ধ-রীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিমানস, এখানে আর সবই গৌণ। বঙ্কিম, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, শিবনাথ, হরপ্রসাদ পর্যন্ত উনিশ শতকী প্রবন্ধকারবৃন্দ এবং বর্তমান শতকের গোড়ায় রামেন্দ্রসুন্দর, ঠাকুরদাস, পাঁচকড়ি, শ্রেত্রমোহন, বিপিনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, রাখালদাস, সুরেশচন্দ্র, রজনীকান্ত, যোগেশচন্দ্র, গিরিজাশঙ্কর প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের মানসে কল্যাণচিন্তা সক্রিয়ভাবে বর্তমান এবং তা-ই তাঁদের প্রবন্ধরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে এঁদের প্রবন্ধরীতিতে যুক্তির সঙ্গে বিচার, চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের, সাহিত্যচেতনার সঙ্গে সমাজ-চেতনার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। নির্বিশেষ সংস্কৃতিসাধনা, যা দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়—এঁদের আকৃষ্ট করে নি। মূলতঃ ভারতমুখী চেতনার দ্বারা এঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন, ফলে এঁদের

লেখায় ধর্ম, ভারত-সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। এঁদের প্রবন্ধ সেইজন্য বিষয়নির্ভর বা গ্রন্থনির্ভর, তা কেবল প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিমানসটিকে পরিস্ফুট করার কাজে নিযুক্ত হয় নি।

প্রমথ চৌধুরীতে প্রবন্ধরীতির পরিবর্তন সাধিত হল, মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে। নবীন উৎসাহ ও অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতিক্ষেত্রে পরিভ্রমণের ক্লান্তিহীন আনন্দে তা উজ্জীবিত। বিশ্ববীক্ষায় তৎপর বিদগ্ধ মার্জিত পরিশীলিত রসিক মনের হাসির আলোকে উজ্জ্বল একটি প্রবন্ধলোকে আমরা উত্তীর্ণ হই প্রমথ-প্রবন্ধাবলীতে। বিষয়বস্তু এখানে প্রধান নয়, প্রধান বিষয়বস্তুর ভাষ্যকার-মানসটি। প্রমথ-পর্বের বাংলা প্রবন্ধকে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টি বলেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। এখন আর প্রবন্ধ বলতে 'চিন্তাগর্ভ অনতিদীর্ঘ গদ্যরচনা'কে বোঝায় না, বা 'তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ গদ্যাংশ'কে বোঝায় না। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আজ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে, চিন্তার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার গণ্ডীকেই আমরা এখন স্বীকার করি না। আর তা হয়েছে 'সবুজপত্রে'র কল্যাণে।

বাংলা গদ্য তার জন্ম থেকে সংবাদপত্রের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধরীতিতেও সংবাদপত্রের প্রভাব পড়েছে। বীরবলী প্রবন্ধরীতির সঙ্গে বঙ্কিমী রীতির বড় পার্থক্য এখানে যে, বীরবলী-রীতি সংবাদপত্রের রীতিকে অতিক্রম করে গেছে। তার আগে বাংলা প্রবন্ধরীতি ছিল বিষয়বস্তুনির্ভর। বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতি বিষয়গত আলোচনায় সীমাবদ্ধ, ফলে সেখানে প্রবন্ধের গদ্য সেকালের সংবাদপত্রের মন্থরগতি গদ্যের অনুসারী। সেকালের সংবাদপত্রের উপজীব্য সমসাময়িক বাঙালি সমাজ; বঙ্কিমী-প্রবন্ধের উপজীব্যও একই। ফলে গত শতকে এই দুই প্রবন্ধরীতি ও গদ্যরীতি ভিন্নতর চেহারায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নি। সংবাদপত্রের গদ্যে ব্যক্তিচেতনা অনুপস্থিত, সমষ্টিচেতনা প্রবল। বঙ্কিম-অনুসারী প্রবন্ধেও তাই হয়েছে। ফলে সেখানে প্রবন্ধরীতি ধূসর অনামিকতায় আচ্ছন্ন, ব্যক্তিচেতনা সেখানে অবলুপ্ত।

এই অবস্থায় প্রমথ চৌধুরী এলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধরীতি নিয়ে—যা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্বাতন্ত্র্যে প্রখর, বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। একটি ঘরোয়া

পরিবেশ সৃজন করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের কৌশল বাংলা প্রবন্ধে এই প্রথম দেখা গেল। কথ্যভাষাশ্রয়ী গদ্যরীতির ধাবৎশক্তি, সাবলীলতা ও আলাপধর্মিতাগুণে সমর্থিত হল এই অন্তরঙ্গ বাতাবরণ। ফলে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিমানসের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। একটি নোতুন প্রবন্ধরীতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রবন্ধরীতি যদি এ দেশে কারুর কাছে ঋণী থাকে, তা হল রবীন্দ্র-প্রবন্ধসাহিত্য। তবে এ দুয়ের চরিত্রগত সাদৃশ্য অল্পই, বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সামান্য মিল আছে।

প্রমথ চৌধুরী মূলত 'এসেয়িষ্ট'—একথাটি আমাদের সর্বদা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রবন্ধ-শিল্প সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর একটি মূল্যবান বক্তব্য এখানে উদ্ধার করি। এর থেকে প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীকে চিনে নিতে পারি। তাঁর কথা এই—

"আমরা যাকে প্রবন্ধ বলি তা ইংরাজী Essay শব্দের প্রতিবাক্য মাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে Essay নেই, ইউরোপীয় সাহিত্যেও ছিল না; Renaissance-এর সময়ে এ-সাহিত্য জন্মলাভ করে। ইউরোপীয় সাহিত্যেও Essay বলতে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে নানা মত আছে, কারণ Essay বহুরূপী। আর ইংরাজী অভিধানেও কথাটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। Johnson এর Dictionary-তে Essay-র অর্থ—a loose sally of the mind—এ ব্যাখ্যা কি ঈষৎ অবজ্ঞাসূচক নয়? সে যাই হোক, Essay বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। জনৈক খ্যাতনামা ইংরাজ লেখক বলেছেন যে, ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায়—প্রথমে ছিল কবিতা, তারপর এল treatise, তারপর আবির্ভূত হল essay; that characteristic literary type of one of our time, a time so rich and various in special apprehensions of truth. (Walter Pater—'Plato and Platoism'.)

একথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস মূলতঃ সত্য, তা হলে প্রবন্ধ যে নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ হবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধসাহিত্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করেছেন, তার কারণ তাঁদের মন was so rich and various in special apprehensions of truth."

['শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ']

প্রমথ চৌধুরীর মতে, প্রবন্ধ হবে নবযুগের বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ, আর বিষয়ের বৈচিত্র্য ও ভাবের ঐশ্বর্যেই প্রবন্ধের মূল্য। আমরা এখানে একটি কথা যোগ করে দিতে পারি—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীর মনও সত্যের বহুবৈচিত্র্য ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ, আর সে মনের আলো পড়েছে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতি ও রবীন্দ্র-প্রবন্ধ-রীতির সঙ্গে তুলনায় বীরবলী প্রবন্ধরীতির স্বাতন্ত্র্য অনুধাবন করা যায়।

বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতিতে বস্তুবিশ্লেষণের গুরুত্ব ছিল বেশি। সমস্যাকে চারদিক দিয়ে পরীক্ষা করে পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের যুক্তি উপস্থিত করে প্রবন্ধের শেষভাগে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা সমাধান এই রীতির নিয়ম। বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতির বাহন যে গদ্যভাষা তার মূলে ছিল আত্মনিরপেক্ষ সমাজবোধ। এই কারণে বক্তব্যকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ও যুক্তিধর্মী করবার দিকেই ঝোঁক ছিল। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি প্রবন্ধের বক্তব্যসর্বস্বতার অনুসরণে বঙ্কিমী প্রবন্ধরীতিতে বক্তব্যসর্বস্বতা দেখা গিয়েছিল। বঙ্কিমযুগে যে মূল্যমানকে দেশ, সমাজ ও জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা চলেছিল, সেটা কাল্পনিকও নয়, নির্বস্তুকও নয়, বরং যুক্তিসিদ্ধ ও ব্যবহারিক। পাশ্চাত্ত্য মননধারা থেকে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে' ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে' চিন্তামূলক গদ্যরচনার প্রসার ঘটেছিল। প্রবন্ধ-গদ্যের এই নৈর্ব্যক্তিকতা বঙ্কিমী যুগের বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে অব্যাহত ছিল। বঙ্কিমী প্রবন্ধ ও গদ্যের বাহন নিটোল অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ। অনুচ্ছেদই বক্তব্যকে সুবিন্যস্ত করে। অর্থকে সংহতিবদ্ধ করে। অনুচ্ছেদরচনার কৌশলেই বক্তব্য পাঠকমনে কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠে এবং স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়। সমস্ত বিষয়টাকে সুসজ্জিত রূপায়িত করে তোলে অনুচ্ছেদ। বঙ্কিমী প্রবন্ধের নিটোল রূপ অনেকটাই নিটোল অনুচ্ছেদ নির্মাণের গুণে। 'বিবিধ প্রবন্ধ' এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ১৮৭২ থেকে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই প্রবন্ধরীতিরই আধিপত্য। বঙ্গদর্শন, প্রচার, ভারতী গোষ্ঠীর গুরু প্রবন্ধ এই রীতিতে রচিত।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দেই রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রবন্ধরীতি ও গদ্যরীতির উদ্ভাবন করেছেন। আত্মভাবকে অবলম্বন করে' রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মননশক্তির উন্মেষ হয়েছে। বক্তব্যসর্বস্বতার স্থানে এসেছে ভাবপ্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণী প্রতিভা ভাববিশ্লেষণেরই প্রতিভা, বস্তুবিশ্লেষণের নয়। রবীন্দ্ররচনাবলীর

অচলিত-সংগ্রহ-ধৃত গদ্যরচনা এর বিশিষ্ট উদাহরণ। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' (১৮৮৩) গ্রন্থটি এই নব প্রবন্ধরীতির প্রথম পরিচয়স্থল। ১৮৮২-৮৫ খৃষ্টাব্দে রচিত প্রবন্ধে রবীন্দ্র-প্রবন্ধরীতির বিশিষ্টতা দেখা গেল। তা সবুজপত্রের (১৯১৪) পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রবন্ধের গদ্যে নোতুনত্ব দেখা গেল 'পথপ্রান্তে' ও 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধ দুটিতে (১৮৮৫/ বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত)। বঙ্কিমীরীতির বক্তব্যসর্বস্বতা, শব্দের আভিধানিক নির্দিষ্টতা, সরল হ্রস্ব বাক্যের তীক্ষ্ণতা ধীরে ধীরে রবীন্দ্র-প্রবন্ধে বর্জিত হয়েছে, তার সূচনা হয়েছে এখানে। বঙ্কিমী রীতির প্রবন্ধে বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ, যুক্তিপারম্পর্য স্পষ্ট, রবীন্দ্র-রীতিতে বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ হলেও অনুভূতির পারম্পর্য প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমের বিষয়াশ্রয়ী রীতি ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ আত্মভাবনাশ্রয়ী রীতি গ্রহণ করলেন। বঙ্কিমী প্রবন্ধে অনুচ্ছেদ নিটোলরূপ পেয়েছে। রবীন্দ্র-প্রবন্ধে অনুচ্ছেদের অসম গঠন চোখে পড়ে। বঙ্কিম যেমন তাঁর মূল বিষয়টিকে পরম্পরাক্রমে বিন্যস্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর ভাবনাটিকে মাত্র জা[illegible]লো করে তুলবার জন্য আলাদা অনুচ্ছেদে স্থাপিত করেন। রবীন্দ্র প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়টি লেখকের নিজের মধ্যে অন্যের সাহায্য ছাড়াই উদ্ভূত হয় বলে' সেটা ভাবনা মূলক। এই জন্য যুক্তিও সহজবুদ্ধির। বক্তব্যকেও রবীন্দ্রনাথ অনুভূতি দিয়েই শক্তিশালী করে তোলেন। তাই উপমা, সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত, কথিকা ইত্যাদিই যুক্তির স্থান নেয়। কখনও কখনও একটি উপমা দিয়েই একটি অনুচ্ছেদ তৈরি হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মতো সমস্যাকে চারদিক দিয়ে পরীক্ষা করে শেষাংশে তদনুযায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি। তাঁর পূর্বচিন্তার সিদ্ধান্ত—সে সিদ্ধান্ত সাময়িক সমাধান মাত্র নয়, একটা উচু নৈতিক মান—তাকেই সাময়িক উপলক্ষের পটভূমিতে স্থাপন করতে করতে রবীন্দ্রনাথ উপসংহারে এসে পৌছান।

প্রমথ চৌধুরীর কলম কবির কলম নয়, রবীন্দ্রনাথের উপমাপ্রিয়তা তাঁকে সাজে না। ভাবপ্রাধান্য বীরবলী প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট্য নয়। ফরাসি 'এসেয়িস্ট' মঁতেনের অনুসরণে তিনি বিশ্বমনস্কতা ও বৈদগ্ধ্যগুণযুক্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতার ঢঙ আশ্রয় করেছিলেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গদিগ্ধ মনের অধিকারী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তা অনুভূতিতে কোমল নয়, নির্মম নিরাসক্ত যুক্তিধর্মী। বঙ্কিমী রীতির অনুসরণে সমাজহিতে ও লোককল্যাণে তিনি

প্রবন্ধ রচনা করেন নি। বিদগ্ধ নাগরিকের বাক্‌ভণিতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, বুদ্ধিদীপ্ত মনের অসিক্রীড়া দেখিয়েছিলেন। শ্লেষ (pun), বিষম ও বিরোধাভাস (epigram, paradox), বক্রোক্তি ও ব্যাজোক্তি (irony) অলংকারের তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের খোঁচায় পাঠকের ঘুমন্ত মনকে জাগ্রত করে তোলাই প্রমথ চৌধুরীর লক্ষ্য। মনের হাসি ছড়ানোই তাঁর উদ্দেশ্য—এ হ'ল 'সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।' ('ভারতচন্দ্র')। বীরবলী প্রবন্ধরীতি ব্যক্তিসর্বস্ব—প্রসাদগুণ (ক্ল্যারিটি) তার অভিষ্ট। প্রসাদগুণ, ভাষার গুণ, কিন্তু তা হচ্ছে মনের গুণেরই প্রকাশ মাত্র। 'অপ্রসন্ন অর্থাৎ ঘোলাটে মন থেকে প্রসন্ন ভাষা আবির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং প্রসাদগুণ হচ্ছে আসলে মনেরই গুণ, ও-বস্তু হচ্ছে মনের আলোক।' (তদেব)। বীরবলী প্রবন্ধরীতির নিয়ামক যে ব্যক্তিত্ব (পার্সন্যালিটি) তা সহাস্য এবং রসাল। পরিপাটি মিতভাষণে—গুছিয়ে কথা বলায়—তাঁর সহজ নৈপুণ্য। বীরবলী প্রবন্ধে তা প্রচুর পরিমাণে আছে।

॥ ৩ ॥

এখন বিচার্য—প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধরীতির আদর্শ কী? প্রমথ চৌধুরী একাধিকবার এ বিষয়ে তাঁর আদর্শরূপে স্বীকার করেছেন মঁতেনের প্রবন্ধাবলী। বস্তুত: 'প্রবন্ধ' যে স্বতন্ত্র সাহিত্যকর্ম, তা মঁতেনই প্রথম দেখিয়েছেন। মিশেল দ্য মঁতেন (১৫৩৩-১৫৯২) সম্ভ্রান্ত নোবল্ বংশের সন্তান। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় তিনি প্রথম যৌবনেই দক্ষতা লাভ করেছিলেন, এ ছাড়া মাতৃভাষা ফরাসিতে তাঁর অধিকার সর্বস্বীকৃতি লাভ করেছিল। বোর্দোর আইনসভায় তিনি উপদেষ্টা নির্বাচিত হন এবং ফ্রান্সের সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর অনুগ্রহ লাভ করেন; মধ্যবয়সে তিনি মঁতেনের দুর্গ, জমিজমা ও দুটি গ্রামসমেত এক বিশাল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন ও লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। বাকি জীবনটা তিনি লেখাপড়াতেই কাটিয়েছেন। পারী-নগরীর ভক্ত মঁতেনের রাজসভায় প্রবেশের অবাধ ছাড়পত্র ছিল এবং তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ হেনরীর বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে যে দলাদলি পারীর রাজনৈতিক

আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছিল, তার থেকে তিনি দূরে সরে যান ও নিজ দুর্গপ্রাসাদে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়টি তাঁর জীবনে মূল্যবান। তিনি নিজেই বলেছেন :

"When I lately retired myself to my own house with a resolution, as much as possibly I could, to avoid all manner of concern in affairs, and to spend in privacy and repose the little remainder of time I have to live, I fancied I could not more oblige my mind than to suffer it at full leisure to entertain and divert itself.. but I find that, quite the contrary, it is like a horse that has broken from his rider, who voluntarily runs into a much wilder career than any horseman would put him to, and creates me so many chimaeras and fantastic monsters, one upon another, without order or design, that, the better at leisure to contamplate their strangeness and absurdity. I have begun to commit them to writing, hoping in time to make them ashamed of themselves."

এইভাবে অশান্ত চিত্ত-অশ্বের উদ্দামতাকে বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়ে মঁতেন 'Essay'-এর সৃষ্টি করেন। ১৫৮০-তে মঁতেনের "Essaies" প্রকাশিত হল; সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নোতুন পথের সন্ধান মিলল। ফরাসিতে 'Essay' কথার অর্থ ই হল কোনও নোতুন প্রয়াস—যা অস্থায়ী বা অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ-বিক্ষিপ্ত প্রয়াসই গাঢ়বন্ধ সৃষ্টিকর্ম 'রচনা'র (Essay) পরিণত হল। এই "Essaies" রচনাসংগ্রহে মঁতেন প্রচলিত সাহিত্যরীতি ও সংস্কারকে অস্বীকার করলেন। যুক্তিতথ্য-সমন্বিত বিষয়-নির্ভর গাঢ়বন্ধ সংহত আলোচনার (Treatise, Discourse, Dissserta-tion) ধারাটিকে মঁতেন সবলে অস্বীকার করে বললেন, এই নোতুন সাহিত্যপ্রয়াসের (Essay) জন্য তিনি কোনও কৈফিয়ত দিতে রাজী নন। এগুলিকে তিনি বলেন, "These are fancies of my own." পাঠক যেন কোনও প্রত্যাশা না রাখেন, "Let nobody insist upon the matter I write, but my method in writing it : let them observe

in what I borrow, if I have known how to choose what is proper to raise or help the invention, which is always my own ; for I make others say for me what, either for want of language or want of sense, I cannot so well myself express." বিষয়বস্তুর ওপর মঁতেন জোর দেন নি, তিনি পাঠকের মনোযোগ দাবি করেছেন বলার ভঙ্গীর প্রতি। কী বলা হল, তার চেয়ে মূল্যবান কেমন করে বলা হল। 'প্রবন্ধাবলী' দু খণ্ড প্রকাশ করে মঁতেন ইতালি ভ্রমণে যান (১৫৮৩) সতেরো মাসের জন্য। এই ভ্রমণের ওপর তিনি যে দিনলিপি লেখেন, তা উচ্চাঙ্গের ভ্রমণ-সাহিত্য। গৃহে ফিরে অগ্নিদাহে, দুর্ঘটনায়, রোগে দুঃখে, মানসিক অশান্তিতে তিনি জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটান। শেষ খণ্ড—তৃতীয় খণ্ড 'প্রবন্ধাবলী' মঁতেন দুঃখ ও রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেই প্রকাশ করেন এবং ষাট বছর বয়সে এই সংসার থেকে চিরবিদায় নেন।

'প্রবন্ধাবলী' (তিন খণ্ড) ও ইতালি-ভ্রমণ-ডায়েরি: মঁতেনের সাহিত্যকীর্তি এইমাত্র। কিন্তু 'প্রবন্ধাবলী'তে তিনি যে সাহিত্যসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দিলেন, তা তাঁকে অবিনাশী গৌরবের অধিকারী করেছে। অধুনা সাহিত্যমূল্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ বা রচনা বলতে আমরা যা বুঝি তার পথিকৃৎ মঁতেন। 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,' 'কৃষ্ণচরিত্র'—আলোচনা-জাতীয় গ্রন্থ (Taeatise, Dissertation)। আর প্রমথ-প্রবন্ধাবলী 'রচনা' (Essay)। এই পার্থক্যের মূলে আছেন মঁতেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যগুরু মঁতেনের প্রবন্ধাবলী মূল ফরাসিতে পড়েছিলেন এবং তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

মঁতেন আধুনিক প্রবন্ধসাহিত্যের জন্মদাতা। তাঁর আগেকার ইংরেজী প্রবন্ধ ও পরের ইংরেজী প্রবন্ধে যে চারিত্রিক পার্থক্য ঘটেছে, তার মূলে আছেন তিনিই। মঁতেনের প্রবন্ধাবলীর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ হয় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে। অনুবাদক জন ফ্লোরিও। তারপর চার্লস কটন অনুবাদ করেন ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে কটনের অনুবাদের মার্জিত সংস্করণ বেরোয়। হ্যালিফাক্স কটন-সংস্করণে মঁতেন সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা করেন। মঁতেন সম্পর্কে ইংরেজীতে এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

তারপর স্টুয়ার্ট, হ্যালাম, হ্যাজলিট প্রভৃতি সমালোচক ও 'রেট্রোসপেক্‌টিভ রিভিউ,' 'ওয়েস্টমিন্‌স্টার রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকা মঁতেন সম্পর্কে গত শতকে আলোচনা করেন। এই সকল অনুবাদ ও আলোচনা প্রমাণ করে ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে মঁতেনের প্রভাব কত গুরুতর। সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকের ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্য ষোড়শ শতকের ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে ভিন্নতর, তা মনোযোগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। প্রবন্ধ যে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম, প্রবন্ধরীতি যে নৈর্ব্যক্তিক নয়, তা যে ব্যক্তিচেতনায় উদ্ভাসিত হতে পারে, তার প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেল মঁতেনে এবং তদনুসরণে ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে ; বেকন, ল্যাম, বীরবুম, হাডসন, ভের্ণন লী, কনরাড, লেস্‌লি ষ্টিফেন, হ্যাজলিট, চেষ্টারটন, উলফ, বাটলার তার প্রমাণ।

মঁতেনের কাছে প্রবন্ধশিল্পীরা কয়েকটি বিষয়ে ঋণী। প্রবন্ধ যে ব্যক্তিচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হবে, তা য পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসম্মিত সম্পর্ক স্থাপন করবে, তা যে বিষয়নির্ভর না হয়ে ভাবনিষ্ঠ হবে, বক্তব্যকে ছাড়িয়ে উঠবে প্রকাশরীতি এবং সর্বোপরি প্রবন্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণত হবে, এই চেতনার মূলে আছেন মঁতেন। বাংলা প্রবন্ধরীতিতে যিনি পরিবর্তন ঘটালেন, সেই প্রমথ চৌধুরী এই মঁতেনেরই ভাবশিষ্য। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

মঁতেনের তিনখণ্ড প্রবন্ধাবলীতে এক সংসার-অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, মানব-চরিত্র নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত, পরিহাস-রসিক, ব্যঙ্গপ্রবণ বিদগ্ধ উদার পরিশীলিত রুচিবান ভদ্র জনের সাক্ষাৎ মেলে। কতো বিচিত্র বিষয়ে তিনি লেখনী চালনা করেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নির্বিশেষ জ্ঞানসাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তা পূর্বধৃত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখেছি। প্রাচীন সংস্কৃতি ও বর্তমান জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর অবাধ পরিভ্রমণ। কতো বিষয়েই না তিনি লিখেছেন ! দুঃখ, অনিদ্রা, সাধুতা, অনৃতভাষণ, আলস্য, পাণ্ডিত্য, বন্ধুত্ব, নির্জনতা, বার্ধক্য, মত্তাবস্থা, গন্ধ, গৌরব; ক্রোধ, সংসার-অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, গ্রন্থচর্চা, নামকরণ, প্রাচীন আদবকায়দা, বর্তমান ঠাট-ঠমক, কল্পনা, দর্শনচর্চা, বাক্যালাপ শিল্প, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, ভাল-মন্দ, নারী ও পুরুষ, রন্ধনবিদ্যা, ছলাকলা, ভীরুতা : হরেকরকম বিষয় নিয়ে মঁতেন লিখেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনটিকে প্রকাশ করেছেন।

প্রবন্ধাবলীর মুখবন্ধে (১২ই জুন, ১৫৮০) সেনর মঁতেন বলেছেন :

"This, reader, is a book without guile. It tells thee, at the very outset, that I had no other end in putting it together but what was domestic and private. I had no regard therein either to thy service or my glory ; my powers are equal to no such design. It was intended for the particular use of my relations and friends, in order that, when they have lost me, which they must soon do, they may here find some traces of my quality and humour, and may thereby nourish a more entire and lovely recollection of me. Had I proposed to court the favour of the world, I had set myself out in borrowed beauties ; but 'twas my wish to be seen in my simple, natural and ordinary garb, without study or artifice, for 'twas myself I had to paint. My defects will appear to the light, in all their native form, as far as consists with respect to the public. Had I been born among those nations, who 'tis said, still live in the pleasant liberty of the law of nature, I assure thee I should readily have depicted myself at full length and quite naked. Thus, reader, thou perceivest I am myself the subject of my book ; 'tis not worth thy while to take up thy time longer with such a frivolous matter ; so fare thee well."

এই মুখবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এর মধ্য দিয়ে মঁতেনের চরিত্র ও মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই। 'আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু'—দম্ভভরে এ কথা পাঠককে মঁতেনই প্রথম বলেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনের প্রীত্যর্থে রচিত প্রবন্ধাবলীতে মঁতেন নিজস্ব অকৃত্রিম স্বভাবটিকে দেখাতে চেয়েছেন। জগদ্ধিতায় লোকহিতার্থে সাহিত্যচর্চার বাসনা তাঁর একেবারেই নেই।

একান্ত ব্যক্তিগত সুরের প্রাধান্য এই প্রবন্ধাবলীতে লক্ষ্য করি। ইংরেজী প্রবন্ধসাহিত্যে এর অনুসৃতি দেখা যায় চার্লস ল্যামের প্রবন্ধে।

অধুনা ব্যক্তিক নিবন্ধ বা 'পার্সোনাল এসে' বলতে আমরা যে সাহিত্যকৃতিকে বুঝি, তার মূল উৎস এখানেই। চেস্টারটন, লীকক, লিণ্ড, উলফ, বীরবুম, লেসলি ষ্টিফেন প্রমুখ ব্যক্তিক নিবন্ধকার মঁতেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বাংলা রম্যরচনা তার সাম্প্রতিক অতি-তারল্য ও অগভীরতা সত্ত্বেও ল্যাম, লিণ্ড, চেস্টারটন এবং প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত, তা অবশ্যস্বীকার্য। সস্মিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন মঁতেন, তাই লিণ্ড-কথিত দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতা ('a lucky dip into experience or into fantasy—often into both'), তাঁর যথার্থ বিবরণ, একথাও স্বীকার্য। মঁতেনের 'প্রবন্ধাবলী'তে খেয়ালী কল্পনার উচ্ছ্বাস ও অভিজ্ঞতার নির্যাস নিশ্চিতরূপে বর্তমান, এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

॥ ৪ ॥

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসস্মিত ব্যক্তিগত আলাপনের সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে, এ সত্য মনোযোগী পাঠকের অজানা নয়। জগদ্ধিতায় লোক-কল্যাণে সাহিত্যচর্চায় মঁতেনের মত শিষ্য প্রমথনাথেরও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। সাহিত্যকে কিণ্ডারগার্টেনে পরিণত করার তীব্র প্রতিবাদ তিনি করেছেন। আবার সামাজিক রীতিনীতিকে গুরুর অনুসরণে ব্যঙ্গের চাবুক মেরে সংশোধিত করতে চেয়েছেন। সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে মঁতেন তাঁর তিন খণ্ড 'প্রবন্ধাবলী'তে বিক্ষিপ্তভাবে যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, প্রমথ-প্রবন্ধে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'প্রবন্ধাবলী'র প্রথম খণ্ডের ২৫ সংখ্যক প্রবন্ধে শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে মঁতেন যে মত ব্যক্ত করেছেন, প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ সংখ্যক প্রবন্ধে মঁতেন বইপড়া সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, বীরবল 'বইপড়া' (আমাদের শিক্ষা) প্রবন্ধে সে কথাই বলেছেন। 'প্রবন্ধাবলী'র পূর্বধৃত মুখবন্ধে মঁতেন যা বলেছেন, 'খেয়ালখাতা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে প্রমথনাথ তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। বীরবল

বলেছেন, "আমাদের কাজের কথায় যখন কোন ফল ধরে না তখন বাজে কথায় ফুলের চাষ করলে হানি কি। যখন আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করবার কোন উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ-মিটিয়ে নেবাব চেষ্টা করাটা আবশ্যক। খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমাব অতি আদরের সামগ্রী—যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমী।" এই কথারই অনুসৃতি লক্ষ্য কবি 'চুটকি' প্রবন্ধে ('বীরবলের হালখাতা')। আসলে মঁতেনের মত প্রমথ চৌধুরীও খেযালী লঘু কল্পনা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার কারবাবী ছিলেন। সেজন্যই প্রবন্ধ-সংগ্রহে যে প্রমথ চৌধুরীর দেখা পাই, তিনি মঁতেনের মতই একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ পরিহাসরসিক বিদগ্ধ রুচিবান ব্যঙ্গপ্রবণ উদার হৃদয় সামাজিক।

মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই সাযুজ্য মঁতেনের ভাবশিষ্যরূপে প্রমথ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠিত কবেছে এবং একটি নবতব প্রবন্ধরীতি প্রবর্তনের সহায়তা করেছে। 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ' ও 'তরজমা' (বীরবলের হালখাতা), 'সবুজপত্রের মুখপত্র', 'নূতন ও পুবাতন', 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' ও 'ফবাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (নানাকথা) প্রবন্ধগুলি, বিশেষতঃ শেষোক্তটি প্রমথ চৌধুরীর মানসপ্রবণতা কোনদিকে, তার সাক্ষ্য দেয়। মঁতেনের জীবনদর্শন ও প্রবন্ধরীতি—উভয়ই প্রমথ চৌধুরী আত্মসাৎ করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর খেযালখাতা খুলেছিলেন,এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধরাজ্যে প্রথম, যিনি বলেছেন, 'I am myself the subject of my book।' সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ব্যক্তিচেতনায় উদ্ভাসিত মননশীল যুক্তিশৃঙ্খলাযুক্ত পরিচ্ছন্ন রূপের আদি কাঠামো প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ। ফরাসীরা বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার) নয় তা ফরাসী নয়।' প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ-রীতির মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রচার করেছেন। সারল্য, স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা, আলো : প্রমথ চৌধুরীর আরাধ্য বস্তু এবং প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে' তার অভাব নেই।

জনৈক ইউরোপীয় সাহিত্যিক বলেছেন, "তুওম্ আ দ্যু পাত্রি—লা সিয়েন, এ পুই লা ফ্রাঁস।" অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই দুটি মাতৃভূমি; একটি তার নিজস্ব, অপরটি ফ্রান্স। এই সত্য বাংলা সাহিত্যে যদি কেউ আপন সাহিত্যসাধনায় দেখিয়ে থাকেন, সে ব্যক্তি বীরবল, ওরফে প্রমথ চৌধুরী। বীরবলী প্রবন্ধরীতি তার অন্যতম পরিচয়স্থল।

৮ | বীরবলী চিন্তারীতি ও জীবনদৃষ্টি

উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বসমরের শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছর যাবৎ প্রমথ চৌধুরী লেখনী চালনা করে গেছেন। তাঁর গদ্যরীতি ও প্রবন্ধরীতি বাংলা সাহিত্যে যে নোতুনের সন্ধান দিয়েছে তা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে লক্ষ্য করেছি। শুধু তাই নয়, প্রমথ চৌধুরীর চিন্তারীতিও স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। তাঁর চিন্তারীতি অতীতকে অস্বীকার করে নি, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাংলা সাহিত্যে চিন্তারীতির একটা আদর্শ তত্ত্ববোধিনীর যুগ থেকে দেখা গেল। সে চিন্তারীতির লক্ষ্য জীবনাদর্শের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব-রচনা। আর তার ধারক একটা আদর্শ প্রবন্ধ-রীতিও গড়ে উঠেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায় পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে যে প্রবন্ধরীতি ও গদ্যরীতি ব্যবহার করেছিলেন, তা এই প্রয়াসের পরিচায়ক। সোজা করে বলা যায়, উনবিংশ শতকের প্রবন্ধরীতির আদর্শ—সমাজকল্যাণ, ধর্ম দর্শন ইতিহাস সমাজ-বিষয়ক তত্ত্বমূলক ব্যক্তি নিরপেক্ষ আদর্শের সন্ধান। এই প্রবন্ধ-রীতির বাহন যে গদ্যরীতি, তাতেও এই আদর্শ প্রতিফলিত: শৃঙ্খলা, পারিপাট্য, সংহতি, যথাযথতা, আভিধানিক স্পষ্টতা, অলংকারবিরলতা ও বক্তব্য প্রাধান্য।

অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত সকলেই জীবনাদর্শের একটা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব রচনার প্রয়াস করেছেন। তাঁরা জীবনের কোনো একটি ধ্রুব মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তুলতে চেয়েছেন। ইতিহাস সমাজ ব্যক্তি সম্পর্কিত সকল ঘটনায় প্রাকৃতিক নীতিনিয়ম

আরোপ করে তার অনুকূল নোতুন সমাজগঠনের পথনির্দেশে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

একালে উনবিংশ শতকের বাঙালি মনীষার শেষ প্রতিনিধি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমথ চৌধুরীর সমসাময়িক। উভয়ের চিন্তারীতি আলোচনা করলেই বীরবলী চিন্তারীতির প্রকৃতি আমাদের কাছে সাবয়ব হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস।

"রামেন্দ্রসুন্দর জ্ঞানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখেছিলেন। জ্ঞান তাঁর কাছে পদার্থবিজ্ঞান। এই বিশ্বচরাচরে তিনি লক্ষ্য করেছেন 'নিয়মের রাজত্ব'—জগতে কোথাও অনিয়ম নেই, সকল ঘটনার অন্তরালে নিয়মের অলঙ্ঘ্য শাসন রয়েছে, মির‍্যাকল বা অলৌকিক ঘটনা মানুষের কল্পনা মাত্র, যতক্ষণ মানুষ বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে না, ততক্ষণই মির‍্যাকলের আধিপত্য; যখনি বিশ্বরহস্যকে বিজ্ঞান-যুক্তি দিয়ে দেখি, তখনি নিয়মের রাজত্ব।

রামেন্দ্রসুন্দরের 'কর্মকথা' (১৯১৩) গ্রন্থে নিয়মের রাজত্বেরই স্বীকৃতি। তাঁর কাছে 'ধর্মের জয়' কথাটির অর্থ বিশ্বচরাচরব্যাপী 'scheme of things'-এর জয়, তাই হ'ল ঋত, তাকেই বলে Law। জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম তাঁর কাছে নীতি-নিয়ম বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি কোথাও ঈশ্বরের কথা বলেন নি, তাঁর কাছে ঈশ্বর 'ধর্ম বা 'মহানিয়তি', আপনার নিয়ম-শৃঙ্খলায় আপনি বদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিবাদিতার প্রধান অবলম্বন ছিলেন গত শতকের দুই ইংরেজ মনীষী—চার্লস ডারউইন ও হার্বার্ট স্পেন্সার। ডারউইনের বিবর্তনবাদ জগৎ ঈশ্বর ও মানবসৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তাক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল, চিন্তায় শৃঙ্খলা প্রাধান্য পেয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ডারউইনের বিবর্তনবাদকে ও হার্বার্ট স্পেন্সারের জীবন সংজ্ঞা (জীবন একটা সামঞ্জস্য স্থাপন) গ্রহণ করেছিলেন, ফলে তাঁর চিন্তায়, রচনায়, ও গদ্যরীতিতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য প্রাধান্য লাভ করেছিল।" [বর্তমান লেখকের 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস', পৃ ৩২৮ ২৯]

সুতরাং রামেন্দ্রসুন্দর উনবিংশ শতকের চিন্তার উত্তরাধিকারী—একথা বলা যায়। তিনি 'ধর্ম' শব্দটির তাৎপর্য যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আচারের তত্ত্ব যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, সমষ্টিবাদী চেতনা ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, তা উনবিংশ শতকের মনীষার

লক্ষণযুক্ত। তবু রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তালোকে বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিস্বাদী চেতনার ঢেউ এসে পৌঁচেছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বিচিত্র জগৎ' (১৯২০) গ্রন্থে। 'জড় জগৎ' ও 'প্রাণের কাহিনী' প্রবন্ধদুটিতে আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, বের্গস'র সৃষ্টিশীল প্রাণতত্ত্বের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। রামেন্দ্রসুন্দর ইউরোপীয় মননধারায় যে যুগান্তর ঘটেছে, তার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, কিন্তু ডারউইন-স্পেনসারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করে' বের্গস'র মতানুযায়ী সৃষ্টিব গতিধারায় প্রাণ ও চেতনার অন্তহীন রূপসৃষ্টি-তত্ত্বকে একমাত্র সত্য বলে' আশ্রয় কবেন নি। তা কবলেন প্রমথ চৌধুবী, এখানেই তিনি এক স্বতন্ত্র চিন্তারীতির প্রবর্তক-রূপে দেখা দিলেন।

প্রমথ চৌধুরীব মননে বের্গসঁব প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর স্বীকৃতি বের্গস' 'আমার দার্শনিক গুরু' ('নবযুগ', বৈশাখ ১৩২৭, প্রমথ-গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ, পৃঃ ২৭৮)।

বের্গস'র L'Evolution creatice ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে (ইংরেজি অনুবাদ Creative Evolution) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বের্গস' ডারউইন-স্পেনসাব-এর যান্ত্রিক নিয়মতত্ত্বের উপরে প্রাণকে (Elan vital) স্থান দিযেছেন, বুদ্ধির (Intelligence) উপরে বোধিকে (Intuition) স্থাপিত করেছেন, বিশ্বের মধ্যে প্রাণকে, গতিকে আবিষ্কার করেছেন। বের্গস' বলেন, বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান বা বিশ্বজগতের অবিচ্ছিন্ন গতিপ্রবাহের তত্ত্বব্যাখ্যান বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব না, বোধিব পক্ষেই সম্ভব। বোধিব সাহায্যে বের্গস' উপলব্ধি করেছেন, বিশ্বমানস ব্যক্তিমানসেরই বৃহৎ সংস্করণ—'The universe is a great individual akin to ourselves'; বিশ্বমনেব অন্তর্নিহিত শক্তি 'an underlying elan, akin to the will in us', নিত্য নিয়ন্ত্রণ করছে সৃষ্টিতত্ত্ব, অব্যাহত রাখছে অবিচ্ছিন্ন গতিধারাকে, রচনা করছে নব নব বসুন্ধরা। বের্গস'র কাছে গতিই প্রাণ, গতিই জীবন, গতিই ঈশ্বর, সৃষ্টিই জীবন। সৃষ্টিশীল গতিতত্ত্ব বের্গস'র কাছে ঈশ্বর-রূপে দেখা দিয়েছেন। প্রমথ চৌধুবী এই শক্তিকে বলেছেন নবীন, রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যে এই নবীন যৌবনেরই বন্দনাগান। বের্গস'র কথায়—

This power is God. He is 'concrete eternity' or 'the concreation of all durations' In Him all the tendencies of

the universe are perfectly united. He is the creative activity which is the fundamental basis of all life, and which is not exhausted in the finite impetus which constitutes the life in our solar system. He is 'incessant life, action, freedom'. Each personality is fundamentally, akin to Him; each individual is, so to speak, one tendency, one idea, in the onward moving life of the whole; every single will is a pulsation in that life. ['Bergson's Philosophy'—J. M. Kellar Stewart, pp. 90]

বের্গসঁ-ব্যাখ্যাত সৃষ্টিশীল প্রাণতত্ত্ব কীভাবে প্রমথ-মননকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, এবার তার পরিচয় গ্রহণ করি।

সবুজপত্র পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যানেই এই প্রেরণা ব্যক্ত হয়েছে।

১। পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই। কেবলমাত্র ভক্তির শান্তি-জলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ['সবুজপত্র', বৈশাখ ১৩২১, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১]

২। আমরা উন্নতিশীলই হই আর অবনতিশীলই হই—আমরা সকলেই গতিশীল, কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর-কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। ['সবুজপত্রের মুখপত্র' বৈশাখ ১৩২১, তদেব]

৩। প্রাণ পদার্থটির গূঢ়তত্ত্ব আমরা না জানলেও তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপর দিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা।......সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। [তদেব]

৪। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই এক-পথের পথিক, এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। ['নূতন ও পুরাতন', পৌষ ১৩২৯, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

৫। জীবনের কাছ থেকে পালানো সহজ। তার সঙ্গে লড়ে জয়ী হওয়াই কঠিন। কেননা এ লড়াই চিরজীবনব্যাপী, এক মুহূর্ত তার বিরাম নেই। ['বাঙালি-পেট্রিয়টিজম্', অগ্রহায়ণ ১৩২৭, তদেব]

উদ্ধৃত পঙ্ক্তোক্তি থেকে আমরা অনায়সে সিদ্ধান্ত করতে পারি, প্রমথ চৌধুরী বের্গস-র গতি ও প্রাণতত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন। গতিই জীবন, স্থিতিই মৃত্যু—এই বিশ্বাস এখানে উচ্চারিত। প্রাণের গতি সর্বদাই সামনের দিকে, এগনোই প্রাণের ধর্ম। ইউরোপের জঙ্গমতা আমাদের দিশারী, একথা তিনি বিশ্বাস করেন। শুধু তাই নয়, জাগ্রত মনের ঐতিহ্যানুস্মৃতি ও সিস্‌কার সম্পর্কে বের্গস'র ইঙ্গিত প্রমথ চৌধুরী গ্রহণ করেছেন।

বের্গস'র ভক্ত প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন, জগৎ ব্যাপারের মূল কারণ প্রাণ, elan vital-ই জগতের সকল শক্তির উৎস।

আমাদের দেহ আছে, মন আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। 'প্রাণ' জিনিসটা কী? এক মতে, প্রাণ দেহের বিকার। অপর মতে আত্মার বিকার। এক দল বিশ্বাস করেন প্রাণ মূলতঃ আধিভৌতিক, অপর দলের সিদ্ধান্ত প্রাণ মূলতঃ আধ্যাত্মিক। সকল যুগে সকল দেশে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়—কখনও এ-মত, কখনও ও-মত প্রবল হয়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ মূলে একই মত; কেননা উভয় মতেই এমন একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের স্থাপন করা হয়, যার আসলে কোনো স্থিরতা নেই।

প্রমথ চৌধুরী এ দুই পন্থা ছেড়ে মধ্য পন্থার দিকে ঝুঁকেছেন, সেখানেও তিনি তিনি বের্গস'র মতের অনুগামী। সে পন্থা হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্তার স্বীকৃতি। এই মতকে তিনি বলেছেন ভাইটালিজম্। এই মতকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন,

"আমার বিশ্বাস, অপ্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসংগত হবে না যে, প্রাণ কখনো অপ্রাণে পরিণত হবে না। তারপর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয় তা হলে প্রাণকেই জগতের মূল

পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বলতে পারি—জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড় প্রাণের সুপ্ত অবস্থা, আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে।......ভাইটাল ফোর্স নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা।" [প্রাণের কথা, শ্রাবণ ১৩২৪, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ—এ তিনের মধ্যে প্রভেদ কোথায়—এ প্রসঙ্গের আলোচনা করে প্রমথ চৌধুরী সিদ্ধান্ত করেছেন, উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম স্থিতি, পশুর প্রত্যক্ষ ধর্ম গতি আর মানুষের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম হচ্ছে মতি। এখানেই মানুষের মুক্তি—মাটির ও স্বভাবের বন্ধন থেকে মুক্তি।

"সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার' অর্থ হচ্ছে আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্ত ভাব রক্ষা করা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওযা উচিত।......মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে-বাইরে যে গতিশক্তি আছে, তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত চালিত। এই মতিগতির শুভপরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানজীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ুঃ বৃদ্ধির অপর কোনো অর্থ নেই।" (তদেব)।

এই অর্থেই প্রমথ চৌধুরী জীবনবাদী, এখানেই তাঁর চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য।

তিনি বিশ্বাস করেন, মানসিক জড়তার হাত থেকে মুক্তি লাভ আমাদের অভীষ্ট এবং মনের জাগরণ ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। সমাজের শাসন থেকে মুক্ত, প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত, যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্র থেকে মুক্ত মন প্রমথ চৌধুরীর কাম্য। এখানেই তিনি অক্ষয়-বঙ্কিম থেকে রামেন্দ্রসুন্দর পর্যন্ত প্রবাহিত যে উনিশ শতকী চিন্তাধারা, তাকে বর্জন করে নোতুন পথে যাত্রা করেছেন। ব্যক্তিত্বকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় তিনি বলেছেন,—

আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই-ই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু

একজনকে আর পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও কথনো আর-পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে 'অপরের মত হও', আর তার নিষেধ হচ্ছে 'নিজের মত হোয়ো না।' ['সবুজপত্র', বৈশাখ ১৩২১, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১]

প্রচলিত ছাঁচে-গড়া শিক্ষাপদ্ধতি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক নয়, সংহারক: এই বিশ্বাসে উদ্বোধিত হয়ে প্রমথ চৌধুরী কঠিন মন্তব্য করেছেন,—

'যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত-বিদ্যা নিজে অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়, গুরু উত্তর-সাধক মাত্র। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উলটো। সেখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে।' ['বই পড়া', শ্রাবণ ১৩২৫, তদেব]

মনুষ্যত্বের ব্যাখ্যা উনবিংশ শতকের বাঙালি মনীষীরা বিভিন্ন ভাবে করেছেন, তার অন্যতম হল শিক্ষাসূত্র। যে শিক্ষাপদ্ধতিতে ব্যক্তি-মানুষ সমাজের উপযোগী হয়ে ওঠে, সে শিক্ষাপদ্ধতির সমর্থক তাঁরা ছিলেন। ইউটিলিটি বা উপযোগিতাবাদ ও পজিটিবিজম্ বা ধ্রুববাদের সমর্থন গত শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে ধ্বনিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী সোজাসুজি তার বিরোধিতা করেছেন। এখানে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-অনুসারীদের পথ বর্জন করেছেন। কোনো নৈতিক মান বা সামাজিক উপযোগিতার মান তাঁর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হয় নি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও মনের চর্চাই তাঁর অভীষ্ট। একথা বলা যেতে পারে, উনবিংশ শতকের যুক্তিবাদ ও বিংশ শতকের যুক্তিবাদ এক নয়। তার কারণ পূর্বোক্ত যুক্তিবাদের মূলে ছিল সমষ্টিবাদী চেতনা, শেষোক্ত যুক্তিবাদের প্রবর্তনা ব্যক্তিত্ববাদী চেতনার প্রবর্তনা। প্রমথ চৌধুরী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, মননাশ্রয়ী ও প্রাণবাদী বলেই স্পেন্সার-ডারউইনের যান্ত্রিক নিয়মতত্ত্ব, কঁতের ধ্রুববাদ ও মিলের

উপযোগিতাবাদের বিরোধিতা করেছেন। এখানেই উনবিংশ শতকের বাঙালি মনীষার চিন্তাসূত্রের সঙ্গে তাঁর সংযোগটি ছিন্ন হ'ল।

বীরবলী চিন্তারীতির আধুনিকতা আর একটি ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর খণ্ড ভাবনার পক্ষপাতী। কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। জীবনাদর্শের সামগ্রিক তত্ত্বরচনায় উৎসাহী ছিলেন না। প্রমথ চৌধুরী মূলত প্রবন্ধকাব, 'এসেয়িষ্ট'—এ সত্য মনে রাখলে তাঁর চিন্তাপদ্ধতির অনুসরণ করা সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর খণ্ড ভাবনার প্রতি তাঁর পক্ষপাত তিনি গোপন করেন নি। একালের মানুষের কাছে অতীত অপেক্ষা বর্তমান অনেক বেশি মূল্যবান এবং বর্তমান সাহিত্য বর্তমানেরই একটি অঙ্গ বলে তা ক্ষণবাদী ও চুটকি সর্বস্ব, একথা তিনি যত্নের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে-সব উক্তি করেছেন, তা থেকে তাঁর মনন ধারাটির পরিচয় পাই।—

'অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসা দুইই বেশি আছে। আমরা ইভলিউশন পন্থী; সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠেছে।...আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশি মূল্যবান।......এ [নব] সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোট গল্প, খণ্ড কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে, কোনো নূতন মেঘনাদ বধ, বৃত্রসংহার কিংবা শকুন্তলাতত্ত্ব লেখা হয় নি,একথা সত্য। এযুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনো কর্তব্য নেই, এ কথা একালে মানা কঠিন।.... .আমরা কোনো সৃষ্ট পদার্থের বিষয়ে দু শ হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হইনে, অন্ততঃ কোনো কাব্যবস্তুকে সে জালে জড়াতে চাইনে।...এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, একালের লেখকরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন।' ['বর্তমান বঙ্গসাহিত্য', কার্তিক ১৩২২, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১]

॥ ২ ॥

প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিবাদী আয়াসসাধ্য মানবিকতা আমাদের বর্তমান প্রয়োজনে নানা কারণে একান্ত মূল্যবান। একথা মানি, রবীন্দ্রনাথের স্বয়ম্ভর প্রতিভার তৃপ্তিহীন ব্যাপ্তি আজকের পটে, আমাদের দারিদ্র্য, মূর্খতা, অন্ধ সংস্কারানুগত্যের মধ্যে আকাশের মতো মনোরম কিন্তু দূর। এ ক্ষেত্রে প্রথম চৌধুরীর দুর্লভ সহৃদয়তা ও মননশীলতা, সজাগ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ বস্তুচেতনা আমাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। বিগত দুই শতকের ইতিহাসে নানা বাধাবিপত্তির কারণে যে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতা এখনও আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীকে অবনত রেখেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযানে ঐতিহাসিক কার্যকারণ ও প্রয়োগবিস্তার মূল্যবান। প্রমথ চৌধুরীর সমাজ-বিষয়ক প্রবন্ধ নিচয় এক্ষেত্রে আমাদের একান্ত সহায়ক।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের উন্নতি কতদূর হয়েছে, অবনতিই বা কতটা হয়েছে, তার আলোচনায় প্রমথ চৌধুরী সজাগ বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভর বিচারশীল মননের পরিচয় দিয়েছেন।

ইউরোপীয় জীবনচর্যার নানাদিক আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে আমরা গত শতকে বিদেশীয়তা স্বদেশি রকমে অভ্যাস করেছি, সাহেব হয়েছিলুম বাঙালিভাবে, তার ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন নানা দোষের আকর হয়ে উঠেছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশি নিয়মে চর্চা করতে হবে। সাহেবিয়ানার প্রচণ্ড নেশা থেকে মুক্তি পাবার উপায় কি? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন,

দৈনিক জীবনে আমরা নকলেই অভ্যস্ত, আচার-ব্যবহারের অধীন। ভুল করেছি—এই জ্ঞান জন্মানো মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ করতে পারলে ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্তন শুধু সময়সাপেক্ষ। ['তেল নুন লকড়ি' ফাল্গুন ১৩১২, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

সজাগ বুদ্ধি ও স্বাধীন মন, প্রমথ চৌধুরীর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি আধুনিক জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আপন বক্তব্য উপস্থিত করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী সমষ্টিবাদী নন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। আধুনিক সভ্যজগতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য। প্রাচীন হিন্দুসমাজ ছিল সমষ্টিবাদী, ব্যক্তি ছিল সমাজশৃঙ্খলার অধীন। তারপর এই প্রাচীন ভারতে এসে পড়ল ইউরোপীয় বন্যার প্রবল স্রোত। তার ফলে কিছু লোক হয়েছেন উচ্ছৃঙ্খল, বাদ বাকি সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন। এই শৃঙ্খলাহীন উদ্দেশ্যহীন স্রোত থেকে আমাদের উদ্ধার পাওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন।

তার উপায় কি? প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস, 'ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জাতি যদি কোনো স্থায়ী সুফল লাভ করে থাকে তো সে মনে, আর যা যা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে, সে বাহ্য আচার-ব্যবহারে। ...সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট ও জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, এমন আর অন্য কোনো শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয় নি।' (তেল নুন লকড়ি)

বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ-গুণ এত অল্প কথায় বিশ্লেষণ আর কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু এই বিশ্লেষণ উনবিংশ শতকের বাঙালি মনীষীরাও করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের সংস্পর্শে আমাদের পরিবর্তন—উন্নতি বা অবনতি—আলোচনা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। বিস্ময়কর চিন্তাসমতার পরিচয় চারজনেই দিয়েছেন। নিম্নধৃত উক্তি নিচয়ে তা প্রমাণিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি: আমরা যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্বসকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার। কোনো কোনো সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোনো কোনো সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষালাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতা লাভ বহুকালসাপেক্ষ, দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোনো অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি সভ্যতর জাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুত গতিতে আসিতে থাকে। সে স্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয় যে, অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ-প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালীর চরিত্র-দোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণমাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখন কখন তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে এই অনুকরণ-প্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না, ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণ-প্রবৃত্তি থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণ-প্রবৃত্তি অব্যবহিত-রূপে স্ফূর্তি পাইলেই সর্বনাশ উপস্থিত হইবে। ['অনুকরণ', বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ, ১৮৮৭]

রবীন্দ্রনাথের উক্তি: এখন আমরা যে সংসারের মধ্যে সহসা এসে পড়েছি এখানে প্রাণ এবং মান রক্ষা করতে হলে, সর্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার-বিচার নিয়ে খুৎ-খুৎ করে, বসনেব অগ্রভাগটি তুলে ধরে, নাসিকার অগ্রভাগটুকু কুঞ্চিত করে, একান্ত সন্তর্পণে পৃথিবীতে চলে বেড়ালে চলবে না। ......এখন যদি প্রতিষ্ঠা চাও তো চিত্তের উদার প্রসারে সর্বাঙ্গীণ নিরাময় সুস্থ ভাব, শরীর ও বুদ্ধির বলিষ্ঠতা, জ্ঞানের বিস্তার এবং বিশ্রামহীন তৎপরতা চাই।......

সংকীর্ণতা এবং নির্জীবতা অনেকটা পবিমাণে নিরাপদ, সে কথা অস্বীকার কবা যায না। যে সমাজে মানবপ্রকৃতির সম্যক্ স্ফূর্তি এবং জীবনের প্রবাহ আছে সে সমাজকে বিস্তর উপদ্রব সইতে হয, সে কথা সত্য। যেখানে জীবন অধিক সেখানে স্বাধীনতা অধিক, এবং সেখানে বৈচিত্র্য অধিক। সেখানে ভালো মন্দ দুইই প্রবল। যদি মানুষের নখদন্ত উৎপাটন করে, আহার কমিয়ে দিয়ে, দুই বেলা চাবুকের ভয দেখানো হয়, তা হলে এক দল চলৎশক্তিরহিত অতি নিরীহ পোষা প্রাণীর সৃষ্টি হয়; জীব-স্বভাবের বৈচিত্র্য একেবারে লোপ হয়; দেখে বোধ হয়, ভগবান এই পৃথিবীকে একটা প্রকাণ্ড পিঞ্জররূপে নির্মাণ করেছেন, জীবের আবাসভূমি করেন নি।......

নিজের মধ্যে সজীব মনুষ্যত্ব থাকলে তবেই প্রাচীন এবং আধুনিক মনুষ্যত্বের, পূর্ব ও পশ্চিমের মনুষ্যত্বকে নিজের ব্যবহারে আনতে পাবা যায়। ['নূতন ও পুরাতন', বৈশাখ ১২৯৮/১৮৯১]

স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি: এক দিকে, নব্যভারত বলিতেছেন, পাশ্চাত্ত্যভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই, আমরা

পাশ্চাত্ত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্যসম্পন্ন হইব ; অপর দিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন, মূর্খ, অনুকরণ-দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না ; সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয় ?......

তবে কি আমাদের পাশ্চাত্ত্য জগৎ হইতে শিখিবার কিছুই নাই ? আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিবার কোন প্রয়োজন নাই ? আমরা কি সম্পূর্ণ ? আমাদের সমাজ কি সর্বতোভাবে নিশ্ছিদ্র ? শিখিবার অনেক আছে, যত্ন আমরণ করিতে হইবে, যত্নই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ['বর্তমান ভারত', ১৮৯৯]

প্রমথ চৌধুরীর উক্তি : অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক। এবং অনুকরণে যেহেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করা যায় না, সেই কারণে আমরা বিলেতি সভ্যতার উপকরণে আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে তুলেছি।......

ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় ; আজকের দিনে নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নূতন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক না কেন, মাটির গুণে তাকে স্বদেশি হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্তি পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চা করেছিলুম, কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জন করা যায় না, এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্তমান অশান্তি শুধু নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর অব্যবহিত বিকারের ছটফটানি নয়। ['তেল নুন লকড়ি', ফাল্গুন ১৩১২/১৯০৬]

পরের জিনিসকে আপনার করে নেবার নামই তরজমা। সুতরাং ও কার্য করাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা, নিজের ঐশ্বর্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি নেবার

যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না।······আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য সভ্যতার তরজমা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তরজমা না করে শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনোরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। অনুকরণ ত্যাগ করে যদি আমরা এই নবসভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তা হলেই সে সভ্যতা নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমাদের নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।
['তরজমা', মাঘ ১৩১৯/১৯১৩]

উদ্ধৃত উক্তি নিচয় থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রমথ চৌধুরী উনবিংশ শতকের বাংলার চিন্তা-ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি, বঙ্কিমী যুগের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নি। তথাপি তিনি যে মুক্ত মননের পরিচয় দিয়েছেন, সেকথাও অবশ্যস্বীকার্য। যে নবীন জগৎ আমাদের জীবনের নবদ্বারে ফলফুলে শোভিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল, প্রমথ চৌধুরী তার ফসল ঘরে তুলে আনতে চেয়েছিলেন। এই নবীনের কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো দ্বিধা ছিল না। আমরা গতি চাই, উন্নতি চাই, নবীনকে চাই, সামনের দিকে এগোতে চাই—একথা প্রমথ চৌধুরী বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ে তাঁর আস্থা ছিল না, দুয়ের মধ্যে তিনি বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছিলেন! তাই তিনি পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দেহ নয়, প্রাণকে আয়ত্ত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তার প্রমাণ নিম্নধৃত উক্তি দুটি—

'আমরা রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষ-রূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারি, তা হলেই আমাদের সমাজ নব কলেবর ধারণ করবে।'
['তরজমা']

'অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির পক্ষে যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এতো সর্বলোকবিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বিরুদ্ধে গতি নামক 'বিরোধটি জাগিয়ে' রাখা মূর্খতা এবং সেটিকে ঘুম

পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝা-যুঝি করেই জীবন স্ফূর্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে, জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি।··· বাঙালির প্রথম দরকার সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়, মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো।' ['নূতন ও পুরাতন', পৌষ ১৩২১/১৯১৪, প্রবন্ধসংগ্রহ ২]

প্রমথ চৌধুরী সমন্বয়বাদী রক্ষণশীল চিন্তানায়ক নন, প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ববাদী তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যিনি বিরোধের মধ্য দিয়ে নবীনকে পেতে চান।

ব্যক্তির মুক্তিতে প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন। তিনি আরো বিশ্বাস করেন, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবনে। যৌবন বলতে তিনি দৈহিক যৌবনের প্রতি ইঙ্গিত করেন নি, মানসিক যৌবনের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন। মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠাই তাঁর কাম্য কেননা দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন, মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকেব মনে সঞ্চার করে দেওয়া যায়।

প্রাণের ধর্ম কি কি? প্রমথ চৌধুবী তিনটি ধর্ম লক্ষ্য করেছেন— জীবনপ্রবাহ রক্ষা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা এবং প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরণের মধ্য দিয়ে আপন অস্তিত্ব রক্ষা। "প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ·অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হযে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্যনূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য

সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস। এই মানবিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।" ['যৌবনে দাও রাজটিকা', জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, প্রবন্ধসংগ্রহ ২]

সুতরাং প্রমথ চৌধুরীকে বলা যেতে পারে প্রাণবাদী—যিনি পরিবর্তনে ও অগ্রগতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁর সংগ্রাম জড়বাদ ও মায়াবাদের বিরুদ্ধে।

॥ ৩ ॥

ইউরোপকে প্রমথ চৌধুরী কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছেন? এই প্রশ্ন আলোচনার মধ্যেই উত্তর নিহিত আছে।

প্রথম বিশ্বসমরের পরে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রে ইউরোপীয় সভ্যতার মূল সন্ধান করেন। একথা ঠিক, ঐ বিশ্বসমর ইউরোপীয়দের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়ে দিয়েছে। সূক্ষ্মদর্শী ইউরোপীয়দের চোখে পড়েছে যে মনোরাজ্যে ঐক্যস্থাপন করতে না পারলে ইউরোপীয়ের জীবনে ঐক্য থাকবে না, কেননা রাজনৈতিক স্বার্থ ও ঔদরিক স্বার্থ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে না, বিভেদের সৃষ্টি করে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে অর্থাৎ প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে। পরে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "আমি যখন স্কুলে পড়তুম, তখন সেকালের B A., M. A.-রা ভক্তিভরে Buckle's *History of Civilization* পড়তেন; আর সেই পুস্তকেই, শুনতে পাই, সভ্যতার চরম আধিভৌতিক ব্যাখ্যা আছে। তারপর পণ্ডিতেরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিয়োগ্রাফিই সে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। ['ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি', আষাঢ় ১৩৩৭, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

তাহলে ইউরোপের ঐক্য কোথায়, মুক্তি কোথায়? এরিয়ান্ জাতির ধমনীতে নীললোহিত আর্যশোণিত প্রবাহিত বলেই নর্ডিক জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি

—এই ধারণাকে প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গ করেছেন, এথ্‌নলজি অ্যানথ্রপলজি প্রভৃতি নববিজ্ঞানকে ভূমিসাৎ করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর চিন্তার আধুনিকতা এইখানে যে, ভৌগলিক সুবিধায় বা শোণিত শ্রেষ্ঠত্বে তিনি বিশ্বাস করেন না, মনের আভিজাত্যে বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি বলেছেন,

"ইউরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম ইউরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, ইউরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানবসভ্যতার সৃষ্টি জিয়োগ্রাফি করে না, করে হিস্টার; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন।" (তদেব)

পরন্তু তিনি মানবসভ্যতাকে অখণ্ড ও অবিভাজ্যরূপে দেখেন ও বিশ্বাস করেন, সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়। আধ্যাত্মিক কারণ বলতে তিনি আত্মার আত্মপ্রকাশকে বুঝিয়েছেন।

প্রথম বিশ্বসমরে ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি আলগা হয়ে পড়েছিল বলেই ইউরোপ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়েছিল: এই বিশ্বাসবলে প্রমথ চৌধুরী সিদ্ধান্ত করেছেন,

"ইউরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিস্টরি, জিয়োগ্রাফি নয়; অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়; আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ 'moral and intellectual tradition'।" (তদেব)

বস্তুজগতের উপর আত্মার প্রভুত্বই যথার্থ সভ্যতার মূল, বস্তুজগতের উপর নিছক প্রভুত্ব বা মেটিরিয়াল সিভিলাইজেশন সভ্যতার ফলমাত্র। ইউরোপ এই সত্যটি উপলব্ধি করে নি বলেই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছিল।

প্রমথ চৌধুরী প্রশ্নটির গভীরে উপনীত হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার মূল উপাদান সন্ধান করে দেখেছেন যে, গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম —এই তিনে মিলে ইউরোপীয় সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে। খৃষ্টধর্মের আইডিয়ালিজম্‌, গ্রীক রিয়ালিজম্‌ ও রোমান লিগ্যালিজম্‌-এর মিলনের ফলে ইউরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে। কিন্তু এ মিলন স্থায়ী হয় নি, কারণ রেনেসাস যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃষ্ট নীতি ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক হতে শুরু করে, ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার ব্যালান্স ভঙ্গ হয়। এ সত্য অনেকদিন ইউরোপের চোখে ধরা পড়ে নি।

শেষটা পলিটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ যখন ইউরোপের মনকে গ্রাস করলে তখন গ্রীক বুদ্ধি ও খৃষ্ট ধর্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। শেষ আঘাত এলো প্রথম বিশ্বসমরে, ভেঙে পড়ল ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি।

যে তিন উপাদানের উপর ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার কাঠামোটা ভেঙ্গে গেছে বলেই সংকট দেখা দিয়েছে। তাহলে ইউরোপের মুক্তি কোথায়? প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন, যে গুণে ইউরোপ সভ্য সে গুণের ধ্বংস নেই অর্থাৎ গ্রীক সভ্যতা ভেঙেচুরে গেলেও গ্রীক দর্শন ও সাহিত্য আজও মানুষকে সভ্য করছে, রোমক সাম্রাজ্য ভেঙে গেলেও রোমক বিধিনিষেধশাস্ত্র মেনেই ইউরোপীয়েরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে আর খৃষ্টধর্মের আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শ পলিটিক্যাল মেটিরিয়ালিজমের ধাক্কায় ভেঙে গেলেও তার ধর্মজ্ঞান ও নীতিধর্ম ইউরোপকে রক্ষা করছে।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপাদান ও ভিত্তির এই বিশ্লেষণের পরে প্রমথ চৌধুরী এক অখণ্ড অবিভাজ্য মানবসভ্যতার উপলব্ধিতে পৌঁচেছেন। এখানেই তাঁর চিন্তার বিশ্বতোমুখিতার পরিচয় পাই। তিনি মানুষকে খণ্ড খণ্ড করে দেখেন নি, অখণ্ড বিশ্বমানব-রূপে দেখেছেন।

"ইউরোপের নবধর্ম ডিমোক্রাসির মূল গ্রীকদর্শন নয, নব বিজ্ঞানও নয়। যে মনোভাবের উপরে ডিমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত সে মনোভাবের স্রষ্টা হচ্ছেন যিশুখৃষ্ট।" অথাৎ ইউযোপীয় মানবের ধর্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান এখন বিশ্বমানবের অধিকারে।

"গ্রীক দর্শন ও রোমান আইন যেমন ও দুই সভ্যতার একচেটে জিনিস নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি, তেমনি মডার্ণ সায়েন্সও বর্তমান ইউরোপের একচেটে জিনিস নয। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবেব করায়ত্ত হবে। ফলে, এ বিষযেও ইউরোপের বর্তমান প্রধান্য আর থাকবে না। .ইউরোপীয় অর্থে এশিয়াও সভ্য হবে।" (তদেব)

সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা; তার মূলে আছে অহংজ্ঞান, তার প্রতিষ্ঠা ভেদবুদ্ধির উপর। যে তিন পূর্বসভ্যতা ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা গড়ে তুলেছে, সে তিনই ভেদবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ভেদবুদ্ধির পরিহার করাই আধুনিক মানবসভ্যতার কর্তব্য। এ পথেই মানবসভ্যতার মুক্তি আসবে বলে প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন। এখানেই তাঁর আধুনিকতা। বলা যেতে পারে, প্রমথ চৌধুরীর মননের একটা স্বাভাবিক

লক্ষণ বিশ্বমনস্কতা। রবীন্দ্রনাথ বলাকা কাব্যের 'ঝড়ের খেয়া' কবিতায় যে মহাসমরোত্তর মানবসভ্যতা সম্পর্কে গভীর আশা পোষণ করেছিলেন, সে আশাই প্রমথ চৌধুরীকে উজ্জীবিত করেছে।

বিশ্বসমরের প্রলয় থেকে নোতুন সৃষ্টি দেখা দেবে, এই আশায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রথম বিশ্বসমরের কারণ জার্মান মিলিটারিজম্, কিন্তু তার কোন নৈতিক বল আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। এই জঙ্গী মনোভাব সভ্যতার শত্রু, এই সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, ইউরোপের তথা মানবসমাজের মুক্তি আসবে এই মিলিটারিজমের অবসানের পথে—

'ইউরোপের সকল জাতির দেহেই এই মিলিটারিজম্ অল্পবিস্তর স্থান লাভ করেছে; একমাত্র জার্মান তা পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকার করেছে। যা অপর সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জার্মানিতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে বরফের এই কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে মিলিটারিজম্ ভস্মসাৎ হয় তা হলে যে কেবল অপরজাতি-সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জর্মানিও পরিবর্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে। যে জাতি মানবাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে দেশে কাণ্ট হেগেল গ্যেটে শিলার বীঠোভেন মোজার্ট জন্মলাভ করেছে, সে জাতির কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা চিরঋণী। এই মিলিটারিজমের মোহমুক্ত হলে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।' ['বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ' অগ্রহায়ণ ১৩২১, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

প্রথম বিশ্বসমরের পরে দ্বিতীয় বিশ্বসমরে পৃথিবী রক্তস্নান করে উঠে আজ আর একটি তৃতীয় বিশ্বসমরের মুখোমুখী হয়েছে। এ-অবস্থায় প্রমথ চৌধুরীর সতর্কবাণী খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

সকল প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও অহং-এর ভেদবুদ্ধি অস্বীকার করে প্রমথ চৌধুরী মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছিলেন, বিশ্বমনস্ক মনন নিয়ে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তিত্ববাদী-মানুষের মনুষ্যত্ব-ধর্মকে তিনি বড়ো করে দেখেছিলেন, তাকে তিনি বুদ্ধি ও যুক্তির পটভূমিতে পেতে চেয়েছিলেন। আধুনিক জ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার, বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার কোনো জাতি-বিশেষের একচেটে

অধিকার নয়, এবং ইউরোপের অকল্যাণে আমাদের অকল্যাণ ও ইউরোপের মঙ্গলে আমাদের মঙ্গল—এই বিশ্বাসে প্রমথ চৌধুরী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মননের এই সার্বভৌমত্ব বিশ্বতোমুখিতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা প্রমথ চৌধুরীর চিন্তার বৈশিষ্ট্য। এখানেই বীরবলী চিন্তারীতির স্বাতন্ত্র্য।

॥ ৪ ॥

প্রমথ চৌধুরীর চিন্তারীতির ঔদার্য ও বিশ্বতোমুখিতা সর্বত্র লক্ষ্যণীয়। কি জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কি জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে, কি পেট্রিয়টিজমের ক্ষেত্রে তিনি কখনো দেওয়াল তুলে দেন নি। তার খানিকটা পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

বিদেশি সাহিত্যচর্চার সার্থকতা কি ? এই প্রসঙ্গের উত্তরে তাঁর বক্তব্য :

"আজকের দিনে ইউরোপের কোনো ভাষাই আর কোনো ভাষার আওতায় পড়ে নেই, সে ভূভাগে এখন সবাই স্বাধীন সবাই প্রধান ; অথচ সে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় এই জাতিস্বাতন্ত্র্যের যুগেও স্বদেশি ভাষা ব্যতীত আরও অন্তত: দুটি-তিনটি বিদেশি ভাষা সাগ্রহে এবং সানন্দে শিক্ষা করেন। এর কারণ কি ? এর কারণ, সভ্যজগতের এ জ্ঞান জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক-হাতে গড়ে নি, এর ভিতর নানা যুগের নানা দেশের হাত আছে। সে কারণ, বিদেশি ভাষা ও বিদেশি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিলে মানুষকে মনোরাজ্যে একঘরে এবং কুনো হয়ে পড়তে হয়। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চায় মানুষের মন জাতীয় ভাবের গণ্ডির মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই যে, মনোরাজ্যে কূপমণ্ডুক হওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, সে কূপের পরিসর যতই প্রশস্ত ও তার গভীরতা যতই অগাধ হোক-না কেন। এবং একথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, জাতি মনে যতই বড় হোক-না কেন, তার মনের একটা বিশেষ রকম সংকীর্ণতা আছে, এবং তার মনের ঘরের দেয়াল ভাঙবার জন্য বিদেশি মনের ধাক্কা চাই। বিদেশির প্রতি অবজ্ঞা বিদেশি মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি জাতির দ্বেষ-হিংসাও প্রশ্রয় পায়। অপরের মনের সম্পর্কে এলে তার সঙ্গে মনের মিল হওয়াটা মানুষের পক্ষে

স্বাভাবিক; কেননা তখন দেখা যায় যে অপর জাতির লোকেরাও আসলে মানুষ, এবং অনেকটা আমাদের মতই মানুষ। সুতরাং বিদেশি সাহিত্যের চর্চায়, শুধু আমাদের মন নয়, হৃদয়ও উদারতা লাভ করে; আমরা শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতিও লাভ করি। অতএব মনোজগতে যথার্থ মুক্তি লাভ করতে হলে আমাদের পক্ষে বিশ্বমানবের মনের সংস্পর্শে আসা দরকার। সত্য কথা এই যে, মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও কোনো দেশভেদ নেই; আমরা আমাদের মনগড়া বেড়া দিয়ে তার মনগড়া ভাগবাটোয়ারা করি, সত্যের আলোকে এসব অলীক প্রাচীর কুয়াশার মত মিলিয়ে যায়।" ['বাংলার ভবিষ্যৎ' অগ্রহায়ণ ১৩২৪, প্রবন্ধসংগ্রহ ১]

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে প্রমথ চৌধুরী বাঙালি জাতিকে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পরামর্শ দিয়েছেন। সকল প্রকার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হবার একটি পথ, তাঁর মতে, সাহিত্যচর্চা, কারণ—

'একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকলকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো-না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক-না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম।' ['অভিভাষণ', ফাল্গুন ১৩২১, প্রবন্ধসংগ্রহ ১]

এবং—

'আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সে সত্য এই যে, বাঙালি জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙালির মনের সকল অঙ্গ ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে।' (তদেব)

স্বদেশপ্রীতি ব্যাপারটিকে প্রমথ চৌধুরী ঊনবিংশ শতকের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বলে বর্জন করেন নি বা বিদেশিপ্রভাবজাত বলে অবজ্ঞার চোখে দেখেন নি। এখানেও তাঁর চিন্তারীতির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত। যাকে তিনি হৃদয়াবেগের মধ্যে পেয়েছিলেন তাকে তিনি মননের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী স্বদেশপ্রীতির প্রকৃতি বিচার করে বলেছিলেন,

'আমরা যাকে স্বদেশপ্রীতি বলি আসলে তা স্বজাতিপ্রীতি। দেশকে ভালোবাসার অর্থ দেশবাসীকে ভালোবাসা—কেননা মানুষ শুধু মানুষকেই ভালোবাসে।···

স্বজাতিপ্রীতির কৈফিয়ত কারো কাছে চাওয়া অন্যায়, কারণ ও হচ্ছে মনের একটা দুর্বলতা। স্বজনবাৎসল্য-রূপ ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য যখন অর্জুনেরও ছিল, তখন আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি।' ['বাঙালি পেট্রিয়টিজম্' অগ্রহায়ণ ১৩২৭, প্রবন্ধসংগ্রহ ২]

এই প্রবন্ধেই তিনি কবুল করেছেন—'আমার মন তিন বিদেশের—ইংলণ্ড ফ্রান্স ও ইতালির—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে।' এখানেই প্রমথ চৌধুরীর মানসগঠনের পরিচয় নিহিত।

প্রাদেশিক পেট্রিয়টিজম্ সংকীর্ণ মনোভাবের পোষক বলে তিনি মনে করেন না। এ অভিযোগের উত্তরে তাঁর বক্তব্য—'নিজের সন্তানকে স্তন দিলে কোনো মায়ের উপর যদি এই অভিযোগ আনা হয় যে, সে মাতা অতি স্বার্থপর, যেহেতু তিনি পাড়াপড়শির ছেলেদের নিজের স্তন্যক্ষীরে বঞ্চিত করছেন, তা হলে সে অভিযোগের কি কোনো প্রতিবাদ করা আবশ্যক? (তদেব)

প্রমথ চৌধুরীর স্বদেশপ্রীতি ঐতিহ্য-বিচ্যুত নয়। স্বদেশপ্রীতির আবেগকে তিনি ঐতিহ্যের সূত্রে বেঁধে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন,—

'আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্বপুরুষরা বিরাজ করছেন, এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্বপুরুষদের সমাজ বিরাজ করছে। বংশপরম্পরা হেরিডিটি হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো উন্নতি অসম্ভব।' ['তেল নুন লকড়ি' ফাল্গুন ১৩১২, তদেব]

এবং পথনির্দেশ করেছেন—

'আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশি না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন মন ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে, বিদেশের পায়ে নয়।' (তদেব)

তত্রাচ পেট্রিয়টিজম্ সংকীর্ণ নয়, স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে তোলাতেই তার সুখ, তার মুক্তি, এও প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন। আধুনিক জগতের ধ্যান-ধারণা আত্মসাৎ করাতেই বাঙালির মনের মুক্তি, এই

বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি বিশ্বপথিক হয়েছিলেন, ভারতপথিক হয়ে ওঠেন নি। এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তা-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন এমন এক বিশ্বমনস্ক চিন্তানায়ক, যাঁর চিন্তালোকে আধুনিক বিশ্ব ধরা দিয়েছিল।

ইউরোপীয় সভ্যতা নবযুগে পদার্পণ করেছে যে তিনটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে, তিনি তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেছেন,

'মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙে পড়ে নি; মানবমনের একটির পর আর-একটি তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে; সে তিন হচ্ছে ইতালির রেনেসাঁস, জর্মানির রিফরমেশন এবং ফ্রান্সের রেভলিউশন।' (বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ) এখানে লক্ষণীয় এই যে, এই তিনের সুফল কেবল ইউরোপের ওপর নয়, আধুনিক জগতের উপর বর্তেছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

আধুনিক ইউরোপের চিন্তাবিপ্লবের পীঠভূমি ফ্রান্সকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশ বলে গণ্য করে বলেছিলেন,

'আমি ফ্রান্সের সেই ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল দলের অন্যতম, যাদের অন্তরে বুদ্ধবচন বিশেষ করে ঘা দেয়।' [পূর্ব ও পশ্চিম' আষাঢ় ১৩৩৪, প্রবন্ধসংগ্রহ ২]

পুনরপি—

'ভারতবর্ষের অপর কোনো জাতি দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথের জন্মদান করতে পারে নি। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, মনোজগতে আমরা বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে একলোকে বাস করি নে। আমাদের অন্তরে জ্ঞানের ক্ষুধা আছে, কাব্যরসের পিপাসাও আছে। এর ফলে মনোজগতে আমাদের কাছে বসুধৈব কুটুম্বকম্, এবং সেই কারণে ইউরোপের সাহিত্যবিজ্ঞানের শিক্ষা আমরা যতটা আত্মসাৎ করেছি, ভারতবর্ষের অপর কোনো জাত তদনুরূপ পারে নি।' [বাঙালি পেট্রিয়টিজম্]

এটাই আসল কথা, মনোলোকে প্রমথ চৌধুরী বিশ্বলোকের অধিবাসী। সে-কারণে তিনি যে বাংলাদেশকে পেতে চেয়েছেন, সে দেশ অতীতে নেই, বর্তমানেও নেই, আছে ভবিষ্যতে। তাঁর কথায়, 'যে দেশকে আমি অন্তরের সহিত ভালোবাসি, সে বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও

নয়—ভবিষ্যৎ বাংলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে। সুতরাং আমাদের বাঙালি পেট্রিয়টিজম্ বর্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজমের বিরোধী নয়।' (তদেব)

॥ ৫ ॥

শেষ প্রশ্ন প্রমথ চৌধুরী কি আমাদের চিন্তালোকে কোনো নোতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন?

বের্গস‍ঁ-ভক্ত প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন,

"প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্যনূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই।" ['যৌবনে দাও রাজটিকা']

'জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে, জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙ্গে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি।' ['নূতন ও পুরাতন']

সুতরাং প্রমথ চৌধুরীর কাছে কোনো ধ্রুব আদর্শ, স্থির মূল্যমান আশা করা উচিত নয়। মনের সজীবতা ও প্রাণশক্তির যৌবনকে যিনি আশ্রয় করেন, কোনো অবিচল আদর্শকে তিনি আঁকড়ে থাকতে পারেন না। রূপ হতে রূপে প্রাণের যে অবিরাম সৃষ্টিলীলা, সত্যের যে নব নব আদর্শ সন্ধান, প্রমথ চৌধুরী তারই অন্বেষী। ইউরোপের পলিটিকস্, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাস, দর্শন—সবকিছুর প্রতিই তাঁর অপরিসীম আগ্রহ। তিনি আধুনিক বিশ্বলোকের অধিবাসী, কোনো কিছুই তাঁর কাছে বিদেশি বলে ত্যাজ্য নয়। ইউরোপীয় জীবনাদর্শের নানারূপ কীভাবে আমাদের মনে

গেড়ে বসেছে, প্রমথ চৌধুরীর বিশ্লেষণ থেকে তার সামান্য পরিচয় এখানে উদ্ধার করি।

১. 'বহু ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে গেছে যে, সে ভাব দেশি কি বিদেশি তাও আমরা ঠাওর করতে পারি নে। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষ জাতীয় মনোভাব, যার ক থেকে ক্ষ পর্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশি, তাকে আমরা বলি স্বদেশি।' [নূতন ও পুরাতন]

২. 'ইউরোপের কাব্যবিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের মনের উপর নিতান্ত কম নয়। ল্যাফকাডিয়ো হার্ণ-এর বইয়ে পড়েছি যে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক জাপানিদের মনের কোনোখানে স্পর্শ করে না। অপর পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রের কাব্য আমাদের মনের সকল তাবে ঘা দেয়। সে কাব্য আমাদেব মর্ম স্পর্শ কবে এবং সে স্পর্শে আমাদের অন্তরাত্মা পুলকিত হয়।' [বাঙালি-পেট্রিয়টিজম্]

৩. শুধু কাব্য নয়, ইউরোপের বিজ্ঞানও আমাদের অতি প্রিয় সামগ্রী। এ বিশ্ব আমাদের কাছে শুধু জড়জগৎ নয়, ভাবের জগৎও বটে ; ইন্দ্রিয়ের দর্শনের, মনের ধ্যানধারণার বস্তু। আমরা জানি রস খালি কথায় নেই, বিশ্বেও আছে ; রূপ খালি আর্টে নেই, প্রকৃতিতেও আছে। এ বিশ্বের অসীমতা ও অসীম বৈচিত্র্য তার অন্তর্নিহিত শক্তির ছন্দোবদ্ধ লীলা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। এই বিশ্ব নামক মহাকাব্যের রসাস্বাদ করবার কৌতূহল আমাদের অনেকের মনেই আছে। তাই-না বাঙালি যুবক আইনস্টাইনের নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল, যদিচ তারা সবাই জানে এই নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব কর্মে ভাঙিয়ে নেবার আশু সম্ভাবনা নেই। আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাংলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতের বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালির একটা ঝোঁক। (তদেব)

পরিবর্তমান বিশ্বের স্রোতোধারায় অবগাহনের অভিলাষ এই তিনটি উদ্ধৃতিতে চমৎকার ধরা পড়েছে। ইউরোপের সংস্পর্শে এসে আধুনিক বাঙালি মন কত সজাগ সচল উৎসুক কৌতূহলী জিজ্ঞাসু ও সিসৃক্ষু হয়ে উঠেছিল, তারই নিখুঁত আলেখ্য উপরি-ধৃত বর্ণনা। গতির চাঞ্চল্য,

যৌবনের উচ্ছলতা, প্রাণের অন্তহীন লীলার পরিচায়ক এই বিবরণ। এখানে কোনো ধ্রুব সত্য আশা করাই অন্যায়। তবু এ প্রশ্ন থেকে যায়, প্রমথ চৌধুরী মানবসভ্যতার আলোচনা থেকে কোন মূল্যবোধ পেতে চেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ যে-অর্থে তাঁদের আপন কালে এক একটি বিশিষ্ট মূল্যমান সৃষ্টি করেছিলেন, সেই অর্থে প্রমথ চৌধুরী আমাদের কোন্ নোতুন আদর্শ দিয়েছেন? নবতর চিন্তা-রীতি, নোতুন মননপদ্ধতি, জগৎ ও জীবনকে দেখার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত দৃষ্টিকোণ তিনি আমাদের দিয়েছেন, এবং কোন্ ধ্রুব সত্যে আমাদের উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন?

মানবসভ্যতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রমথ চৌধুরী নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এসব আলোচনার মধ্য থেকে তাঁর কয়েকটি বক্তব্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, এক সভ্যতার সঙ্গে আর-এক সভ্যতার গড়নের পার্থক্য প্রাচীনকালে যেমন স্থূল ছিল, বর্তমানে তেমনি সূক্ষ্ম হয়ে আসছে। একালে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির দেশের ও সেই সঙ্গে দেহের ও মনেরও ব্যবধান কমে আসছে। জাতিতে জাতিতে প্রভেদ কমে আসার ফলে মানবসমাজ এক পরিবার বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে বলে তাঁর ধারণা। তিনি আরো লক্ষ্য করেছেন, জাতিতে জাতিতে প্রভেদ যেমন কমে আসছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ তেমনি বেড়ে চলেছে। এককথায় বিশিষ্টতা এখন জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তিকে আশ্রয় করেছে। তাঁর বিশ্বাস, 'ভবিষ্যতের মানবসভ্যতা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গুণে অপূর্ব বৈচিত্র্য লাভ করবে এবং এই বিচিত্রতাই হবে তার বিশিষ্টতা।' ['ভারতবর্ষ সভ্য কি না', ফাল্গুন ১৩২৫, প্রবন্ধসংগ্রহ ২]

মানবসভ্যতার মূলগত ঐক্যে প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস দৃঢ়, কারণ 'সকল সভ্যতারই ধাতু এক, প্রত্যয় শুধু আলাদা।' (তদেব)

সভ্যতাকে প্রমথ চৌধুরী শিল্পকর্ম বলে মনে করেন। তাঁর কথায়,

'সত্য কথা এই যে, সভ্যতা হচ্ছে একটা আর্ট এবং সম্ভবতঃ সব-চাইতে বড় আর্ট, কেননা এ হচ্ছে জীবনকে স্বরূপ করে তোলবার আর্ট, আর বাদ-বাকি যত কিছু শিল্পকলা আছে, সে সবই এই মহা আর্ট হতে উদ্ভূত এবং তার কর্তৃকই পরিপুষ্ট।' (তদেব)

এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর বিচার এখানেই শেষ নয়। অন্যত্র তিনি বলেছেন,

'সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যতা নানা মূর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে।··· অনেক ফরাসি লেখক বলেছেন যে, যিনিই মানবের ইতিহাস চর্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে মানুষকে ভালো করবার চেষ্টা বৃথা। এ হচ্ছে অবশ্য ক্ষুব্ধ মনের ক্রুদ্ধ কথা, অতএব বেদবাক্য হিসেবে গ্রাহ্য নয়। সে যাই হোক, এ কথার উত্তরে আমি বলি যে, মানুষকে ভালো না করা যাক, ভদ্র করা যায়। পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়।' ['বই পড়া', শ্রাবণ ১৩২৫, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১]

মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী আমাদের সামনে ভদ্রতা ও সুরুচির মূল্যবোধকে বড়ো করে তুলে ধরেছেন। বস্তুতঃ, জীবনে অনুসরণীয় আদর্শরূপে তিনি একেই উপস্থিত করেছেন।

প্রমথ চৌধুরী আমাদের একটি সামাজিক গুণের চর্চা করতে বলেছেন, তা হল বৈদগ্ধ্য। কারণ—

'মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে। এসকল বস্তু সমাজকে উন্নত না হোক, অলংকৃত করে।' (তদেব)

প্রমথ চৌধুরী বাঙালিকে আর-একটি বিষয় চর্চা করতে উপদেশ দিয়েছেন, তা হল রূপের চর্চা। তিনি রূপ জিনিসটিকে অতিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখতে চান। মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে তিনি ঐ রূপের (বস্তুরূপের) আরাধনার নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। গ্রীক ও রোমক সভ্যতায়, চীনা ও জাপানি সভ্যতায়, সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে রূপের চর্চা তিনি লক্ষ্য করেছেন এবং সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত :

"এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ, সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশি শক্তি চাই।" [রূপের কথা, ফাল্গুন ১৩২৩, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

তিনি লক্ষ্য করেছেন, অতীত ভারতবর্ষে যখনই নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই মঠে-মন্দিরে বেশে-ভূষায় মানুষের কথায়-ভাষায় নবসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বৌদ্ধ যুগ ও বৈষ্ণব যুগ ভারতবর্ষ তার উদাহরণস্থল। আমাদের অবতারবৃন্দ সকলেই সৌন্দর্যের অবতার, বস্তুত রূপগুণের সন্ধি-বিচ্ছেদ করা একালের মতো সেকালের শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ছিল না। সংস্কৃত কাব্যে রূপ বর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই, আব সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষতঃ রমণীদেহেব, বর্ণনা। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশে সৌন্দর্যের আবির্ভাব হয়, বৈষ্ণবসাহিত্য তার পরিচায়ক, কিন্তু সে সৌন্দর্যবুদ্ধি টিঁকল না কারণ তা ষোল আনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। বস্তুতঃ প্রাচীন গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চার মতো না হোক, প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপসচেতন ছিল। এইসব নিদর্শন দেখিয়ে প্রমথ চৌধুরী সখেদে বলেছেন, আমাদের রূপ-জ্ঞানের শোচনীয় অভাব সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। তিনি আমাদের রূপ-সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। আধুনিক বাঙালির কাছে প্রমথ চৌধুরী যে মূল্যবোধ উপস্থিত করেছেন, তা হল—জীবনকে রূপজ্ঞানের মধ্য দিয়ে পাবার নির্দেশ। কারণ—

"রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবমুক্তি, অর্থাৎ স্থূলশরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র।

ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম।" (তদেব)

আমরা তিনটি কথাকে, বুঝি আর না-বুঝি, স্বীকার করি—সত্য শিব আর সুন্দর। সব চাইতে আগে আসে শিবজ্ঞান, তারপর সত্যের জ্ঞান, "সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।" (তদেব)

প্রমথ চৌধুরী আমাদের সামনে এই আদর্শ উপস্থিত করেছেন, সুন্দর ও সুরুচির চর্চায় আত্মনিয়োগে জীবনের সার্থকতা নির্দেশ করেছেন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত মূল্যবোধ পেয়েছি বলে মনে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠায় ও শুভবুদ্ধির চর্চায় তিনি নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, আমাদেরও সে পথে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর মননপদ্ধতি, চিন্তারীতি আমাদের কাছে বুদ্ধি ও যুক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও রুচির স্বাস্থ্যসন্ধানে বিশেষ সহায়। যে কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও যুক্তিহীনতা এখনও আমাদের দেশকে অবনত রেখেছে, তার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন, একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জীবনদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এসব কারণেই আধুনিক কাল ও সভ্যতার চর্চায় প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলী মূল্যবান।

৯ | প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ

সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যায় 'সবুজপত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধে 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' বলে প্রমথ চৌধুরী প্রাণকে বন্দনা করেন এবং এই প্রাণের, তারুণ্যের, যৌবনের উপাসনাই সবুজপত্রের সাধনা, একথা ঘোষণা করেন। তিনি আরো বলেছেন: "প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে, প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়,—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণিজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম জগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।" ('যৌবনে দাও রাজটিকা' জ্যৈষ্ঠ ১৩২১)

এই মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠাই প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ছিল, একথা বলা যেতে পারে। মানসিক যৌবন ক্ষণস্থায়ী ও সংকীর্ণ নয়, তা ব্যাপক, উদার ও চিরস্থায়ী। মানসিক যৌবন কখনোই পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকে না, সাহিত্যক্ষেত্রে চৌধুরী মহাশয় কখনো পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে চান নি। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শে যে নবীনত্ব, বিদ্রোহ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করি, তা এই মানসিক যৌবনের চর্চার ফলমাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সেখানে অন্ধকার গর্ভগৃহ নেই, সবুজের আবাহন আছে। "আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে।" ('সবুজপত্র' বৈশাখ ১৩২১)। এই ভরসা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যলোক তাই প্রাণের রঙীন আলোয় রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্যসাধনার প্রাপ্তি সম্পর্কে তাঁর কোনোরূপ মোহ ছিল না। সাহিত্যসাধনা যে জীবনসাধনারই একটি দিক এবং তা যে আসলে প্রাণের—যৌবনের সাধনা, তা তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। তিনি রূপসাধনায় নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন; জীবনের সর্বত্র রূপানুসন্ধানেই তিনি আনন্দ পেতেন। তার পরিচয় 'রূপের কথা' প্রবন্ধটি। কামলোক থেকে রূপলোকে উত্তীর্ণ হওয়াটাই জীবনের কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। ইন্দ্রিয়ের জগতে যে বস্তুরূপ, প্রমথ চৌধুরী তার থেকেই শিল্পানন্দ আহরণ করতে চেয়েছেন। "রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।" ('রূপেব কথা' ফাল্গুন, ১৩২৩), মনের দারিদ্র্যই আমাদের রূপান্ধ করেছে, এজন্য তাঁর আফশোষের অন্ত নেই। সাহিত্যে এই বস্তুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়লোকের রূপকেই তিনি চেয়েছেন, কেননা তাঁর ধারণা, "আমরা সব জন্মত: কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।" প্রমথ চৌধুরীব সাহিত্যসাধনা এই রূপলোকে উত্তরণের সাধনা। একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, "আমি কৈশোর উত্তীর্ণ না হতে হতেই টের পেয়ে ছিলুম যে, জীবনে কোন্ কোন্ জিনিস আমাকে অধিকার করে নেবে—beauty, mind—এবং এটাও বুঝতে বাকি ছিল না যে আমার মনো-জগতের কেন্দ্র হবে The Eternal Feminine—তবে তখন বিশ্বাস ছিল যে সাহিত্যজগতেই ঐ তিনটি জিনিস পাব—এবং realise করব।" (দ্রঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

প্রমথ-মানসের যে পরিচয় আমরা এখানে পাই, তা থেকে তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রবৃত্তি কোন্ দিকে তা বুঝতে পারি। এখন ভরসা করে তাঁর সাহিত্যাদর্শের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

॥ ২ ॥

সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য কী, এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী তাঁর অভিমত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। সমাজকল্যাণ বা লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্যসৃষ্টিতে

তাঁর সায় নেই। তিনি মনে করেন, "সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। · সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক—এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে, কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না।" ('সাহিত্যে খেলা', শ্রাবণ, ১৩২২) তাই 'সাহিত্যে পাঠকের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা' করার অর্থ লেখকের ধর্মচ্যুতি, এই তাঁর সিদ্ধান্ত।

বিগত শতকে বঙ্কিমচন্দ্র 'নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' উপস্থিত করে বলেছিলেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পরেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।" ('প্রচার', ১২৯১ মাঘ)। প্রমথ চৌধুরী সৌন্দর্যসৃষ্টির তত্ত্বে বিশ্বাসী, মঙ্গলব্রতে তাঁর পুরা অবিশ্বাস। বিপরীত দিকে জোর দিয়ে বলেছেন, সাহিত্য ও শিক্ষা এক বস্তু নয়; "শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনকে জাগানো" ('সাহিত্যে খেলা')। সাহিত্যের উদ্দেশ্যে আনন্দ দান করা, শিক্ষা দান করা নয়, এখানেই তিনি বিগত যুগের সাহিত্যনায়কের পথ থেকে সরে এসেছেন। বঙ্কিম-প্রবন্ধ ও প্রমথ-প্রবন্ধের চরিত্র আলোচনা করলেই এ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্কিম-প্রবন্ধ সমাজ কল্যাণাদর্শে অনুপ্রাণিত, প্রমথ-প্রবন্ধ নির্বিশেষ সংস্কৃতিসাধনায় নিযুক্ত। একের মূল ভিত্তি সমষ্টিচেতনা, কল্যাণমুখিতা, আদর্শবাদিতা, ভাবোচ্ছ্বাস; অপরের ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বমানবিকতা, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা, বুদ্ধির মুক্তি ও ভাবালুতামুক্তি। আনন্দ সৃষ্টি ও পরিবেশনই সাহিত্য সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং একমাত্র উদ্দেশ্য, চৌধুরী মহাশয়ের এই-ই সুদৃঢ় অভিমত। সাহিত্য কি খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "সরস্বতীকে কিণ্ডার গার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্য যতদুর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদুর হতে পারিনি। (তদেব)।

চৌধুরী মহাশয় তাঁর সাহিত্যজীবনে যে কেবল বুদ্ধির মুক্তি সাধনায়

নিজেকে ব্যাপৃত করেছিলেন, তা নয়, বিশ্বমানবিকতার সাধনা ও দেশকালগণ্ডিমুক্ত সাহিত্যপ্রভাবকে আত্মস্বীকৃতি দানের সাধনাও করেছিলেন। কি সমাজে, কি সাহিত্যে তিনি প্রাচীন ও নবীন কোনো সংস্কারকেই প্রধান্য দিতে রাজি হন নি। সংস্কারের অন্ধতা ও মোহের পিছুটান থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস তাঁর রচনায় সর্বত্র বর্তমান।

মনের জগতে তিনি কোন বাধাকেই স্বীকার করেন নি। "স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশী ফুলের আবাদ করা যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারস্য দেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব ও সৌরভের সহিত নবাবি করছে। বহির্জগতে যদি এক ক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তাহলে মনোজগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা, খুব সম্ভব মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্ততঃ অলঙ্ঘ্য পাহাড় পর্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের হাতে গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গ সকল এ যুগে নিত্য ভেঙে পড়েছে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়।" ('বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি' আষাঢ় ১৩৩১)।

এই মনের মুক্তিবায়ু প্রমথ চৌধুরী নিজেই বাংলা সাহিত্যে এনেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যের তীক্ষ্ণ তীব্র রসিকতা ও জীবনদর্শন বাংলা সাহিত্যে তিনিই আমদানি করেন। এবং তা আমাদের মনকে সংস্কার-মোহের অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

যিনি সাহিত্যিক, তিনি সমাজের আজ্ঞাবাহী ভৃত্য নন। যিনি যথার্থ সাহিত্যিক তিনি মনের ক্ষেত্রে মুক্ত, স্বাধীন। "যাঁর স্বাধীনতা নেই, তাঁর সাহিত্যে কোন কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড়জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশী নয়। ধর্মপ্রবর্তক কবি আর্টিস্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক, কেননা তাঁরাই মানব সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি তিনি সমাজের ফরমায়েশ খাটতে পারেন না।" ('তদেব')।

তবে কি সাহিত্যিক যুগধর্মের অধীন? প্রমথ চৌধুরী এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। "যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ প্রথমতঃ যুগধর্ম বলে কোন যুগের

একটি মাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পর বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মন-পদার্থটি কোনো বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক অংশে কালের অধীন, অপর অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য ধর্ম আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা। সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম পরীক্ষিত ও বিচারিত হয়েছে।" তাই সাহিত্যিক কোন বিশেষ যুগধর্মের দাসত্ব করতে পারে না। যে ধর্ম সকল যুগে বর্তমান, সেই নিত্য নব যুগধর্মেরই তিনি প্রবক্তা। 'নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তাহলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য।" ('তদেব')। সাহিত্য নিত্য বস্তু। তাই লেখকের সিদ্ধান্ত, "কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। The light that never was on land or sea. সেই আলোকে বিশ্বদর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবিপ্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্যজগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।" (তদেব)

সাহিত্যে তিনি কখনো সংকীর্ণতা বা প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় দেন নি। বস্তুতঃ তাঁর সাহিত্যসাধনার মূল লক্ষ্যই ছিল তাই। সৎ সাহিত্য-সাধনার ফলশ্রুতি, মনের মুক্তি, এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ মাত্র ছিল না। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানবমনের সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম এবং একমাত্র কর্ম। কোন জাতির মনের ঐক্য সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র হতে পারে, কিন্তু বাঙালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ, এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম, ব্রাহ্মণ শূদ্র, হিন্দু মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকল প্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেন না ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।" (ফাল্গুন, ১৩২১)

সাহিত্য যে সকল প্রকার সংকীর্ণতার জাতশত্রু তার প্রমাণ প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য। ফরাসী, ইতালীয়, পারসিক এবং ভারতীয়—প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু সে প্রভাব ঋণ গ্রহণ নয়, আত্মসাতের নৈপুণ্য। মনোজগতের পথে পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিহার ; সে জগতে তিনি পেত্রার্কা ও ওমর খৈয়াম, ভাস ও ভারতচন্দ্র, মঁতেন ও গ্যয়টে, আনাতোল ফ্রাঁস ও শূদ্রক, ফ্লবেয়র ও বার্ণার্ড শ, রেণাঁ ও উগোর সহযাত্রী।

॥ ৩ ॥

সাহিত্যে কোনো সংকীর্ণতা ও বাধার প্রশ্রয় প্রমথ চৌধুরী দিতে রাজি নয়, তা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। তাঁর মুক্ত মনের পরিচয় আরো পাই, সাহিত্যে নীতি বনাম অশ্লীলতা প্রসঙ্গে। এ বিষয়ে তিনি তাঁর মত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন পাঁচটি প্রবন্ধে : 'জয়দেব', 'ভারতচন্দ্র', 'চিত্রাঙ্গদা,' 'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত' ও 'যৌবনে দাও রাজটিকা'। এই ক্ষেত্রে স্মর্তব্য ফরাসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর অশ্লীলতা সম্পর্কে কোন রকম শুচিবায়ু ছিল না।

'জয়দেব' (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) ও 'ভারতচন্দ্র' (শ্রাবণ ১৩৩৫) এ দুটি প্রবন্ধে তিনি স্বীকার করেছেন, এঁরা দুজন সব সময় শ্লীলতার গণ্ডী রক্ষা করেন নি। কিন্তু তিনি জয়দেবের তীব্র নিন্দা ও ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। জয়দেব যে কামলোকের কবি নন, তা উক্ত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন। গীতগোবিন্দ যে কেবল 'বিলাসকলাকুতূহল' কথা, সে কাব্যে যে কেবল দেহসর্বস্ব নির্লজ্জা রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদের বর্ণনা আছে এবং সেখানে যে রমণীর রূপবর্ণনার অভাব ও কাম-বর্ণনার প্রাবল্য, তাই চৌধুরী মহাশয়কে জয়দেবের প্রতি বিমুখ করেছে। আর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে দেখি আর্টিষ্ট ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা। "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের কাছে শুধু nature"। জয়দেব সেই অপর কবি, তাই তিনি নিন্দিত। জীবনের সকল দুঃখযন্ত্রণা, দৈবদুর্বিপাক, দারিদ্র্য ভারতচন্দ্রকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। "এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের

মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়।" এই দুই প্রবন্ধে দেখি, চৌধুরী মহাশয় আর্টকে সব-কিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। হীরা মালিনী ও সুন্দর কামলোকের নয়, রূপলোকের অধিবাসী। আর জয়দেবের রাধা কামলোকের অধিবাসিনী। এজন্যই প্রমথ চৌধুরী ভারতচন্দ্রের ভক্ত ও জয়দেবের প্রতি বিমুখ।

জয়দেবকে ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছেন, জয়দেবের কাব্যে ভাবের সৌন্দর্য নেই, আছে দেহজ কামনা-বাসনার বর্ণনা। সেজন্য তা আমাদের মনে রসের উদ্রেক করে না, লালসা উদ্দীপ্ত করে। কোনো সৎ কবি এ কাজ করেন না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য কাব্যে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা যেন ভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকাশ পায়, এই তাঁর বক্তব্য। জয়দেবে এই আশা পূর্ণ হয় নি, এজন্যই চৌধুরী মহাশয়ের ভর্ৎসনা।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুটি গুণ প্রমথ চৌধুরী আবিষ্কার করেছিলেন; এতে আছে প্রসাদ গুণ এবং তা রসাল। এই শেষোক্ত বিষয়েই নীতিবাগীশদের আপত্তি। ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা আছে, কিন্তু তাতে আছে আর্ট, তা নেচারের প্রতিফলন নয়; এবং তা সহাস্য। ভারতচন্দ্রকে এখানে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "হাস্যরস যে অনেক ক্ষেত্রে শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করে, তার পরিচয় আরিস্টফেনিস থেকে আনাতোল ফ্রাঁস পর্যন্ত সকল হাস্যরসিকের লেখায় পাবেন। এর কারণ হাসি জিনিসটেই অশিষ্ট, কারণ তা সামাজিক শিষ্টাচারের বহির্ভূত। সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।" এখানেই ভারতচন্দ্র সার্থক শিল্পী।

সংস্কৃত কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে সাহিত্যে নীতি ও রুচির প্রশ্ন প্রমথ চৌধুরী আরেকবার উত্থাপন করেছেন। সেখানে তাঁর আপত্তি সংস্কৃত কাব্যের যৌবনবন্দনায় নয়, এই বন্দনার একঘেয়েমি ও বাড়াবাড়িতে। এই বাড়াবাড়ি অর্থাৎ যৌবনের স্থূল শরীরকে সংস্কৃত কাব্যে এত বেশি আশকারা দেওয়া হয়েছিল যে শেষের দিকে সংস্কৃত কাব্যের অবনতির সময়ে কাব্য স্থূল দেহসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল এবং ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। প্রমথ চৌধুরীর আপত্তি এখানেই। তিনি চান মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা এবং

সে সাধনাতেই তিনি ব্যাপৃত হতে চেয়েছেন। এতো কথার পর তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে যৌবন-ধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম, এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য ; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল তাও অস্বীকার করবার জো নেই।" যৌবনকে অধুনা আমাদের দেশে দমিয়ে দেবার যে চেষ্টা সমাজপিতারা করেছেন, চৌধুরী মহাশয় তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন, এর ফলে আমাদের সামাজিক জীবনশক্তি ও আনন্দহীন হয়ে অকালবার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। সাহিত্যে এর ফল হয়েছে—অস্বাভাবিকতা ; "সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপরদিকে স্কুল মাস্টার"—এ দুয়েতেই তাঁর আপত্তি।

সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নতে কখনো গুরুত্ব দিতে রাজি হন নি। আর্টের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই তাঁর কাছে বড় কথা। এই প্রশ্নটি তিনি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন 'কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত' (বৈশাখ ১৩৩৬) প্রবন্ধে। তাঁর মতে, "শ্লীলতা-অশ্লীলতা সুরুচির কথা, সুনীতির কথা নয়"। সাহিত্যে নীতির প্রশ্ন অবান্তর বলেই তিনি মনে করেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে অশ্লীলতাকে অবশ্যই দোষ বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে অশ্লীলতার অর্থ গ্রাম্য বা indecent ; এ হল দণ্ডীর মত। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে "অশ্লীলতা-দোষ হচ্ছে কাব্য-দেহের দোষ, অপর কোন বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার পোয়েটিক্‌স্‌-এর অন্তর্ভূত. এথিকস্‌-এর নয়"। বামন প্রমুখ আলংকারিকরা বলেন, গ্রাম্যতা হচ্ছে শব্দের দোষ। শব্দ ব্যবহারে দুষ্টতা বা গ্রাম্যতাই অশ্লীলতা। বামনের এই কথাটি অলংকার শাস্ত্রের শেষ কথা বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেন—"ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী"—যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশঙ্কা উদয় হয়, সেই বাক্যই অশ্লীল। সামাজিক অর্থাৎ কালচার্ড লোকের মনে যদি লজ্জা বা ঘৃণার ভাব জন্মে, তবে তার উৎস যে রচনা, তা অশ্লীল। সুতরাং সভ্য সহৃদয় কাব্যরসিক সামাজিকদের প্রীতিপদ রচনাই শ্লীল রচনা। এর পরে আর কোনো কথা

নেই বলে চৌধুরী মহাশয় মনে করেন। আর "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" কথাটি তাঁর কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক বলেই মনে হয়েছে, কেননা যারা এই কথা প্রচার করেন, তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা অর্থাৎ সমাজের স্থিতাবস্থা রক্ষা। এই শ্রেণীর রক্ষণশীল নীতিবাগীশদের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই। "কাব্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকরা ছিলেন beauty-র অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utility-র ভক্ত।" তাই আমাদের রসজ্ঞান ও কাব্য-বিচারবোধ নানা অ-সাহিত্যিক প্রশ্নের পিছুটানে আবদ্ধ। আমরা যদি সভ্য সহৃদয় কাব্যরসিক সামাজিক অর্থাৎ কালচার্ড হয়ে উঠতে পারি, তবেই আমরা সংস্কৃত আলংকারিকদের মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ফিরে পাব, এই তাঁর বক্তব্য। আর আমরা যে নীতি ও মর‍্যালিটি নিয়ে মাথা ঘামাই, তার কারণ আমরা ইংরেজিশিক্ষিত। যদি ফরাসির কাছে পাঠ নিতুম, তবে নীতিবিচার ছেড়ে দিয়ে এস্‌থেটিক ইমোশনকেই আমল দিতুম বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেন।

শুধু মনে করা নয়, কাজেও তিনি তা দেখিয়েছেন 'চিত্রাঙ্গদা' (চৈত্র ১৩৩৪) প্রবন্ধে। তাঁর শিল্পজিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমলোচনা। এখানে তিনি বলেছেন, "বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করতেন যে কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর-একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ রূপলোক সৃষ্টি করেছেন এবং চিত্রাঙ্গদা সেই রূপলোকের প্রতিমা, সে রূপলোকের real। জয়দেব তা পারেননি বলেই ব্যর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যে কোন নীতিবোধের দ্বারা চালিত হন নি, সাহিত্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে চিত্রাঙ্গদা-রূপ 'যৌবন স্বপ্নের অপূর্ব সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র' অংকন করেছেন, এটাই তাঁর প্রতিপাদ্য। পূর্বধৃত প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, কাব্যালোচনায় beauty-র ঠাঁই আছে, সাংসারিক utility সেখানে নিরর্থক। এখানে বলেছেন, "মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility"। আর সে প্রীতিসাধনে চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সাফল্য তর্কাতীত। এখানে সাংসারিক প্রয়োজন ও সার্থকতার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর।

টমসন সাহেব চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিলেন। সুকঠিন তীক্ষ্ণাগ্র বিদ্রূপাস্ত্রে টমসন সাহেবের যুক্তি ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রমথ চৌধুরী এখানে প্রমাণ করেছেন যে আর্টের ক্ষেত্রে নীতি বা মর‍্যালিটির প্রশ্ন অবান্তর ও অ-সাহিত্যিক। "কাব্যের আবেদন মানুষের moral senseএর কাছে নয়, spiritual senseএর কাছে"। এটি যারা ধরতে পারেন না, তাঁরাই অরসিক মনের পরিচয় দিয়ে থাকেন, যেমন দিয়েছেন টমসন সাহেব। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের ভাবসৌন্দর্য ও বাণীলাবণ্য যে চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে, তার সাফল্য সেইখানেই নিহিত আছে। "জীবনে যা ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতের চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট"। চিত্রাঙ্গদা কাব্যের মর্মকথা, একটি ক্ষণমুহূর্তকে অনন্ত মুহূর্তে পরিণত করাব সাধনা।

মদন চিত্রাঙ্গদাকে বলেছিলেন—

আমিই চেতন দিই
এক দিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।

এই কাব্যে এই শুভ পুণক্ষণের কল্পনা, এখানেই তার যাত্রা শুরু। কবি-প্রতিভাবলে এ পুণ্যক্ষণ একটি অনন্ত মুহূর্তে পরিণত হয়েছে।

বসন্ত বলেছেন—

একটী প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন

আর মদন বলেছেন—

সংগীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন
কথা।

তার ফলে 'মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর real চিত্র' আমরা পেয়েছি। অমরতার স্পর্শ লাভ করে রূপলোকের লাবণ্য-প্রতিমা চিত্রাঙ্গদা যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন দেখি—

উষার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায় পূর্বপর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার

মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্য
সুখাবেশে।

টমসন সাহেবের খৃষ্টীয় নীতিবোধে নয়, সহৃদয় কাব্যরসিক সামাজিকের দৃষ্টিতে চিত্রাঙ্গদার অপূর্ব সৌন্দর্য ধরা দেয়, এই-ই প্রমথ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত।

॥ ৪ ॥

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলিতে উপবোক্ত সাহিত্যাদর্শেব প্রতিফলন লক্ষ্য করি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'মলাট সমালোচনা', 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ', 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য', 'শিশুসাহিত্য'।

বর্তমান কালের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুবী যে চিন্তা কবেছেন, ত মৌলিকত্বে ও পথনির্দেশে উল্লেখযোগ্য। বক্ষণশীলেরা যেখানে বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে নিন্দা করেছেন, সেখানে তিনি তাকে সমর্থন কবেছেন। ঐ সমর্থনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়ে যদি আমবা মনে রাখি 'বঙ্গসাহিত্যেব নবযুগ' ও 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' এ দুটি প্রবন্ধের বচনাকাল ১৯১৩-১৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-উত্তরার নবসাহিত্য-আন্দোলনের দশ বছর পূর্বে। 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে তিনি এর চরিত্রবিচাব এবং প্রয়োজনমত সমালোচনা করেন। আর 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি সমকালীন বিরোধী সমালোচনার হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্য কলম ধরেন। বিশ শতকেব প্রথম পাদের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মমতা ও সমর্থন, সমালোচনা ও ক্রটিনির্দেশ পরবর্তীকালেব বিচাবে অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হযেছে, এখানেই এ দুটি প্রবন্ধেব সার্থকতা।

নবযুগের ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছিলেন, 'মানুষের সহিত মানুষের মিলন ঘটানো, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা, কাউকে ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওযা নয়'। নব সাহিত্য এই ধর্মের পোষকতা করে বলেই তা 'রাজধর্ম ত্যাগ করে গণধর্ম অবলম্বন' কবেছে। 'বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকদের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকদের দিন আসছে'। কিন্তু এর ক্রটিও আছে, যেমন গণধর্মের ঝোঁক পড়েছে বৈশ্যধর্মের দিকে এবং কেবল মাসিকপত্রের প্রাচুর্য নয়, সচিত্র মাসিকপত্র

প্রাধান্য লাভ করেছে। 'যেন-তেন-প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তি', এবং ছবি ফাউ দি'য়ে মেকি মাল বাজারে কাটানোর ব্যগ্রতায় সাহিত্যধর্মের বিচ্যুতি লক্ষ্য করে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সাহিত্য যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তা যে আপন মর্যাদায় দাঁড়াতে পারে, সেখানে যে লোভের চেয়ে দারিদ্র্যের মূল্য অধিক, একথা তিনি জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ' (আশ্বিন ১৩২০) প্রবন্ধে। সাহিত্যের চরিত্র ও বিশুদ্ধি রক্ষায় ব্যাকুল প্রমথ-মানসের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

এ প্রবন্ধে তিনি আরেকটি গুরুতর প্রশ্নের আলোচনা করেছেন: আজকের সাহিত্যিকের কর্তব্য কি? তাঁর দুঃখ এই যে সাম্প্রতিক লেখা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়, গালভরা ফাঁপা বুলি তিনি চান না, তাঁর দাবি, 'সাহিত্যে কস (grip) থাকা আবশ্যক। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হলে রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না'—এ তিনি বিশ্বাস করতেন। কাব্যের উদ্দেশ্য 'ভাব প্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা'। এজন্য লেখককে হতে হবে পরের মনোবীণা, নিজের নয়। 'বস্তু-জ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসন' লেখকের পক্ষে অত্যাবশ্যক, এই সংযম-তত্ত্বটি প্রমথ চৌধুরী প্রতিপন্ন করেছেন। এবং সেই সঙ্গে সতর্কবাণী—চাই সতর্ক সাধনা, শৈথিল্যহীন বিচারবুদ্ধি ও বহুকর্ষিত বিদ্যা; 'অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়', তা নোতুন লেখকদের শিখতে হবে।

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' (কার্তিক ১৩২২) প্রবন্ধে তিনি এই সাম্প্রতিক সাহিত্য ও নোতুন লেখকদের হয়ে বিরোধীদের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করেছেন এবং এতে তাঁর নবীন-সাহিত্য-প্রীতিই প্রকাশ পেয়েছে। যে সব বাঙালি সমালোচক উনিশ শতকের সমাজ-সাহিত্য-প্রেমে অন্ধ, তাঁদের তীব্র ব্যঙ্গ তিনি করেছেন। এঁদের অভিযোগ নবসাহিত্যের বিরুদ্ধে: তার সর্বত্র বন্ধ্যাদশা; সমালোচনাসর্বস্ব এই নব সাহিত্যের এখন অন্তিমদশা; এ সাহিত্য এখন বহুফসলী, শস্তা, বিশেষত্বহীন, প্রতিভাহীন চুটকিসর্বস্ব এবং নকল মাত্র। প্রমথ চৌধুরী এ সব অভিযোগ খণ্ডন করে একে নিজ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চৌধুরী মহাশয়ের মতে, অতীত অপেক্ষা বর্তমান ঢের বেশী মূল্যবান। ইভলিউশন ভবিষ্যৎমুখী। বর্তমানের প্রবাহে জাতি ও সাহিত্যের জঙ্গম

রূপটি ধরা পড়ে। অতীত চর্চায় মানসিক ঔদার্য নেই, আছে গুরুবাক্যের নির্বিচার পালন। সাম্প্রতিক বঙ্গসাহিত্যে যে বহুবিস্তার ও বৈচিত্র্য, বহু-জনসমাগম ও কলরব, স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব, রুচি ও ভাবের নব নব রূপ লক্ষ্য করা যায়, তা অভিনন্দনযোগ্য এই কারণে যে, এখানে নবীন প্রাণের ও যৌবনের পরিচয় রয়েছে। একদিন যোগ্যতরের উদ্বর্তন ঘটবে, সেদিনের আশায় আজকের অতিফসল সমর্থনীয়। উনিশ শতকের নবজাগরণের জোয়ারে আজ বিশ শতকের প্রথম পাদে ভাঁটার টান ধরেছে, এটি প্রমথ চৌধুরী অতন্দ্র সাহিত্যবোধের দ্বারা অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি রচনার নাতিদীর্ঘতা, বহু লেখকের সমাগম, গদ্যের বহুচর্চা, ছোট গল্পের প্রাধান্য, কাব্যদেহের পরিবর্তন, উনিশ শতকী সাহিত্যগুরুদের প্রাধান্য লোপ প্রভৃতিকে যুগলক্ষণ বলে মেনে নিয়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথের অতি-বিস্তৃত অপ্রতিহত প্রভাব যে আমাদের পক্ষে প্রয়োজন, তা ঘোষণা করেছেন। বিশ শতকের মধ্যবিন্দু উত্তীর্ণ হয়ে আজ আমরা চৌধুরী মহাশয়ের এই বিশ্লেষণকে মোটামুটি সঠিক বলে মেনে নিতে পারি। এই চরিত্রবিশ্লেষণ প্রমথ চৌধুরীর মানসিক ঔদার্য ও সাহসের পরিচায়ক।

'মলাট সমালোচনা' ও 'শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধ দুটিতে পরিহাসচ্ছলে গুটি কয়েক home-truth তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। এ দুটি প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রয়োজনীয়তা আজো ফুরিয়ে যায় নি। পুস্তকের বহিরঙ্গ-প্রসাধন-বৈচিত্র্য ও আড়ম্বর, সমালোচনার নামে অতিনিন্দা ও অতিপ্রশংসা, প্রশংসাচ্ছলে মাত্রাতিরিক্ত আলোচনা, অচল সাহিত্যকে প্রাণপণে সচল করার জন্য বণিকবৃত্তি অবলম্বন অর্থাৎ অতি-বিজ্ঞাপিত ও মিথ্যা-বিজ্ঞাপিত করার প্রাণান্তকর প্রয়াস, পুস্তকের নামকরণে উদ্ভট মৌলিকতা, অপ্রচলিত ও দুরূহ সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগে হাস্যকর ব্যগ্রতা : এ সবই প্রমথ চৌধুরীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এবং প্রথম প্রবন্ধটিতে এ সব দোষের উপর ব্যঙ্গের নির্মম চাবুক মেরেছেন। শেষে তাঁর তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য : "ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে ও ভাষায় মাধুর্যের ভান ও ভঙ্গি। বঙ্গসাহিত্যে ক্রমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্য আমার এত কথা বলা। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে।" (মলাট-সমালোচনা

অগ্রহায়ণ ১৩১৯)। পুস্তকের বহিরঙ্গপ্রসাধন ও ভাষায় ন্যাকামি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য পঞ্চান্ন বছর আগে করেছেন, আজো তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায় নি। যে ন্যাকামির কথা তিনি বলেছেন, তার উৎস কি রবীন্দ্র সাহিত্য? রবীন্দ্র-প্রভাব কি এই অতিতারল্যের মূলে আছে? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নি; যদি দিতেন, তাহলে হয়ত আরো কিছু নোতুন অপ্রিয় সত্য আমরা জানতে পেতাম।

'শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধের গোড়ায় আমাদের দেশের অকাল-বার্ধক্য সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তার প্রতিধ্বনি শুনি, 'সবুজপত্র', 'সবুজ-পত্রের মুখপত্র' ও 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে। বস্তুত প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্যসাধনার অন্যতম প্রধান বক্তব্য ছিল, আমাদের সমাজে ও সাহিত্যে মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা। এরই অভাবে আমাদের জীবন এত নিরানন্দ, আমরা এত শীঘ্র বার্ধক্যে পৌঁছই ও যৌবনকে অস্বীকার করি। এজন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না, সে দুঃখ প্রকাশ পেয়েছে ব্যঙ্গের মাধ্যমে। এ প্রবন্ধে তারই অনুরণন শুনি—মানসিক জাড্য ও আলস্য, অকালবার্ধক্য ও তারুণ্যবিরোধিতার হাত থেকে আমাদের দেশকে—যৌবনকে বাঁচানো দরকার। এই অবনতির জন্য তিনি আমাদের রক্ষণশীল সমাজ ও শিক্ষা-ব্যবস্থা—উভয়কেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, শিশুসাহিত্য বলে কোনো স্বতন্ত্র সাহিত্য নেই। যা শিশুর উপভোগ্য, তা সর্বোপভোগ্য এবং তা সাহিত্যের নিত্যবস্তু এবং সে সৃষ্টির অধিকারী কেবল প্রতিভাবান লেখক। 'আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে।' শেষকালে পাই তাঁর অম্লমধুর মন্তব্য আমাদের মানসিক বার্ধক্য সম্পর্কে—'আমার মতে, বিশেষ করে শিশুসাহিত্য রচনা হতে আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। আমরা যদি ঠিক আমাদের উপযোগী বই লিখি, খুব সম্ভবত তা শিশুসাহিত্যই হবে।' হাজার বিরোধিতায় যে কাজ হয় না, এই মন্তব্যে সে কাজ হয়েছে, তা অবশ্যস্বীকার্য।

॥ ৫ ॥

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শ আলোচনায় 'বাংলা কাদম্বরী' (পরিচয়, মাঘ ১৩৪৪) ও 'বই পড়া' (শ্রাবণ ১৩২৫) প্রবন্ধ দুটির বিশেষ গুরুত্ব

আছে। বাণভট্ট-চিত্রিত নারীরূপের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রূপতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনা ও সৌন্দর্যদর্শন যে ক্লাসিকাল গ্রীক সৌন্দর্যচেতনার অনুসারী, তার প্রমাণ এখানে রয়েছে। 'বই পড়া' প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, বাঙালি একদিন গ্রীক নগরসভ্যতার পথে সৌন্দর্য ও কাব্যকলার চর্চা করবে এবং বাংলাদেশ প্রাচীন আথেন্সের স্থানাধিকার করবে। এ থেকে তাঁর মানসিকতার পরিচয় পাই। কাদম্বরী আলোচনায় তাঁর রূপচিন্তার পরিচয় পাই। বাণভট্টের চিত্রনৈপুণ্য ও গল্পরচনানৈপুণ্য স্বীকার করেও তিনি তাঁকে 'রূপশিল্পী' রূপেই দেখতে চেয়েছেন। আর্টিষ্ট হিসাবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব হচ্ছে রমণীর রূপ বর্ণনায়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও দেখিয়েছেন—সে হচ্ছে Dream of Fair Women। ইংরেজ কবি Tennyson-এর কবিতায় fair women-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং তিনি কোনো সুন্দরীর স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি ইতিহাস ও কাব্যের পাতার স্তূপর থেকে প্রসিদ্ধ নারীদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এঁদের নাম আছে, কিন্তু রূপ নেই। Helen একটি মর্মরমূর্তি, ও Cleopatra-র চোখ কালো। এর বেশি কিছু নয়। কিন্তু বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকের real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি। বাণভট্ট কেবল রূপের পূজারী—আর সে রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চৌধুরী মহাশয় বাণভট্টকে নমস্কার জানিয়ে বলেছেন, এই রূপ নিত্য অথচ বস্তুভিত্তিক, "এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।" অথচ এই সৌন্দর্য 'সত্য নারীর অতিরিক্ত সৌন্দর্য'। কাদম্বরী কথাকাব্যের তাম্বূল-করঙ্ক-বাহিনী পত্রলেখা নিত্যরূপলোকের অধিবাসিনী, তাই তাকে দেখে চৌধুরী মহাশয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন, "অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছো পত্রলেখা।" তার ক্ষয় নেই, বার্ধক্য নেই, সে রূপলোকের প্রতিমা। এর ধ্যানে চৌধুরী মহাশয় বিভোর হতে চেয়েছেন। বস্তুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ভিত্তিক অথচ নিত্যকালের স্পর্শযুক্ত যে রূপলাবণ্য, সাহিত্যের অমরলোকে প্রমথ চৌধুরী তাকেই পেতে চেয়েছেন। প্রমথ মানসের বহুকথিত রূপচেতনার যে প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করি, তা ইন্দ্রিয়-সচেতন কিন্তু তা ইন্দ্রিয়-সর্বস্ব নয়, তাতে কামনা-লালসা নেই, সুকর্ষিত রূপজ্ঞান আছে; তা কামলোকের ভঙ্গুর বস্তু নয়, রূপলোকের নিত্য সত্য। মার্জিত বুদ্ধি, সুকুমার হৃদয়বৃত্তি,

সজাগ ইন্দ্রিয় ও সচেতন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আর্যমনের অধিকারী প্রমথ চৌধুরী যে সৌন্দর্যদর্শন গড়ে তুলেছেন, তা অবশ্যই সৌন্দর্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুর মনোযোগ দাবি করে।

॥ ৬ ॥

সাহিত্যচর্চার সামাজিক উপকারিতা নিয়ে প্রমথ চৌধুরী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'বই পড়া' প্রবন্ধটিতে। তিনি বিদগ্ধ অর্থে বোঝেন কালচার্ড (cultured)। তাঁর কাছে 'কালচার' নাগরিক সভ্যতার প্রতিশব্দ।

আধুনিক যুগ গণতন্ত্র ডেমোক্রাসির যুগ, আর "ডেমোক্রাসি সাহিত্যের সার্থকতা বোঝে না, বোঝে শুধু অর্থের সার্থকতা।" এইজন্য প্রমথ চৌধুরী প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আথেন্সের অ্যারিস্টোক্রাসির পুনর্জাগরণ কামনা করেন, কারণ সেখানেই ছিল মনের মুক্তি ও সাহিত্যের অবাধ চর্চা।

আর্ট বনাম ডেমোক্রাসি : এই প্রশ্নের উত্তরে চৌধুরী মহাশয় যে কথা বলেছেন, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মনে করেন, "এ যুগের ডেমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে, সম্ভবত: মনে মনে হিংসাও করে, বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ীরূপে বিরাজ করে। অথচ ডেমোক্রাসির এ-সত্য সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লৌকিক মন বস্তুগত বলেই তা মেটিরিয়ালিজমের দিকে সহজেই ঝোঁকে। এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য আর্টের চর্চা আবশ্যক।"

ডেমোক্রাসির নাগপাশ থেকে মানুষের মনকে উদ্ধার করতে পারে সাহিত্য আর এখানেই সহিত্যচর্চার সামাজিক সার্থকতা। "মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্মনীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ, তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি সব হচ্ছে মনগঙ্গার তোলা জল, তার পূর্ণ স্রোত আবহমান কাল সাহিত্যের ভিতরই সোল্লাসে সবেগে বয়ে চলেছে, সেই গঙ্গাতে

অবগাহন করেই আমরা আমাদের সকল পাপ হতে মুক্ত হব।" এই শেষ নয়, তিনি আরো বলেছেন, "মনকে সজাগ ও সবল রাখতে না পারলে জাতির প্রাণ যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে না। তারপর যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের মনপ্রাণ সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। সুতরাং সাহিত্যচর্চার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জাতির জীবনশক্তির হ্রাস করা, অতএব কোনো নীতির অনুসারেই তা কর্তব্য হতে পারে না, অর্থনীতিরও নয় ধর্মনীতিরও নয়।"

চৌধুরী মহাশয় গণতন্ত্রে বা গণসাহিত্যে আস্থা রাখেন না, রাষ্ট্রিক ও মানসিক আভিজাত্যেই তাঁর মুক্তি, কালিদাসের প্রাচীন ভারতের বিলাসবহুল নীতিশাসনমুক্ত নাগরিক জীবনের প্রতি তাঁর তীব্র আসক্তি, এ সত্ত্বেও তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এই কারণে যে, তিনি সাহিত্যচর্চাকে জীবনের সকল কর্মের উপরে ঠাঁই দিয়েছেন এবং সাহিত্য মনের মুক্তি, একথা খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন।

॥ ৭ ॥

জনৈক ইংরেজ লেখক ফরাসি দেশ ও সাহিত্যের গুণগান করতে গিয়ে বলেছেন: "তুতম্ আ দ্যু পাত্রি—লা সিয়েন এ পুই লা ফ্রাঁস"—মানুষ মাত্রেরই দুইটি মাতৃভূমি: একটি তার নিজস্ব, অপরটি ফ্রান্স। ফ্রান্স তার সাহিত্য ও শিল্পে, সমাজে ও প্রকৃতিতে, বিলাসে ও জীবনসম্ভোগে নিখিলমানবের মনে মুক্তির বার্তা বহন করে আনে, এটাই উক্ত মন্তব্যের সারাৎসার। বাংলাদেশে যদি কোনো লেখকের এই মন্তব্য করার পূর্ণ অধিকার থাকে, তবে তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী।

ভাষার ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরী চেয়েছিলেন আমরা ফরাসি গদ্যের অনুশীলন করি। ফরাসী গদ্যের যে গুণগুলি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তা হচ্ছে—ঐক্যসমতা, প্রসাদগুণ, ভদ্রতা ও সংযম। এই গুণগুলি ফরাসি ভাষা তথা সাহিত্যের অন্তরে নিহিত আছে। আমাদের ভাষার অন্তরে ফরাসি ভাষার গতি ও স্ফূর্তি বর্তমান, এই বিশ্বাসে তিনি ফরাসি গদ্যরীতির চর্চা করতে আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রে—জীবনদর্শনে ও মানসিকতায় আমরা যদি ফরাসি

সাহিত্যের অনুশীলন করি, তবে আমাদের মনের মুক্তি ঘটবে, তাঁর এই গভীর বিশ্বাসের ফল 'ফরাসি সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩) প্রবন্ধটি। বস্তুত প্রমথ-মানস ও তাঁর সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে এই প্রবন্ধ বিশেষ সহায়তা করে। ফরাসি সাহিত্যের মোহিনী শক্তির আকর্ষণে তিনি ধরা দিয়েছেন, ফলে ফরাসি সভ্যতার অনুরাগী হয়েছেন, একথা তিনি এ প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন।

ফরাসি সাহিত্য যে বস্তুগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়জগতের প্রতি সমস্ত অনুরাগ ও মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছে, তা যে আলোকপ্রিয় অর্থাৎ স্পষ্ট স্ফুট মনোভাবের কারবারী, তা যে স্বচ্ছ উজ্জ্বল, তা যে স্পষ্টভাষী অর্থাৎ ভাষায় জড়তা বা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই, তা যে হাসতে জানে এবং তীক্ষ্ণ হাসির বাণে সমাজ ও সাহিত্যের সকল অনাচারের মর্মভেদ করতে পারে, তা যে স্বচ্ছ চিন্তার বাহক, চিন্তার ধূম নয়, উজ্জ্বল আলোর উপাসক, সেজন্যই প্রমথ চৌধুরী ফরাসি সাহিত্যের অনুরাগী। এই গুণগুলি তিনি নিজের জীবনে চর্চা করেছেন এবং বাঙালি তার চর্চা করুক, তা একান্তভাবে কামনা করেছেন; এমন কি একথা বলেছেন, "ফরাসি সভ্যতার নির্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের মনোজগতের আলো নিভে যাবে।" নিখিল মানবমন স্বচ্ছতা উজ্জ্বলতা প্রসাদগুণ ও অনির্বাণ আলোকের জন্য ফরাসি সাহিত্যের চর্চা করবে, এই আশা সমগ্র প্রবন্ধটিতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। আরো একটি কারণে তিনি ফরাসি সাহিত্যের, বিশেষ করে গদ্যসাহিত্যের ভক্ত। "ফরাসি সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে। অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি, ভক্তির না হোক, প্রীতির উদ্রেক করে। কেননা তার চর্চায় স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে শিখি, এবং সেই সঙ্গে আমার ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হামবড়ামি, মানসিক আলস্য ও জড়তা, হয় পরিহার করতে নয় গোপন করতে শিখি। ফরাসি সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়, সুসভ্য করে তোলে। ফরাসি সাহিত্য সকলপ্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসি-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্বপ্রধান গুণ।" এখানে ফরাসি সাহিত্যের যে চরিত্র বিশ্লেষণ প্রমথ চৌধুরী করেছেন, তার আলোকে প্রমথ-মানসকে চিনে নিতে আমাদের এতটুকু কষ্ট হয় না।

প্রমথ চৌধুরীর প্রিয় বাঙালি লেখক, কবি ভারতচন্দ্র রায়। ভারতচন্দ্রের কাব্যে তিনি আবিষ্কার করেছেন, প্রসাদগুণ ও আদিরস। এই প্রসাদগুণ আসলে মনেরই গুণ, ও বস্তু হচ্ছে মনের আলোক। ভারতচন্দ্রের 'সরল ও তরল ভাষা' এসেছে তাঁর প্রসন্ন মন থেকে। ভারতচন্দ্রের আদিরস বা অশ্লীলতা nature-এর নয়, তা art-সম্ভূত এবং তা গম্ভীর নয়, সহাস্য। ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস, চৌধুরী মহাশয়ের মতে, 'আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক; জীবন নয়, মন। 'সাহিত্যের হাসি শুধু মুখের হাসি নয়, মনেরও হাসি। এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, সামাজিক মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।' ভারতচন্দ্র এই হাসির অধিকারী। ভারতচন্দ্র-বিশ্লেষণ করে প্রমথ চৌধুরী যে ক'টি গুণের দেখা পেয়েছেন, তা সবই ফরাসি সাহিত্যে বিশেষভাবে চর্চা করা হয়েছে। তাই ভারতচন্দ্র-শিষ্য প্রমথ চৌধুরী বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ভক্ত পাঠক। ভারতচন্দ্রের ভাষার প্রসাদগুণ ও তাঁর মানসধর্ম তাঁকে ফরাসি লেখকদের সঙ্গে একাসনে বসার অধিকার দিয়েছে, একথা প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন এবং শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, "আমার বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসি সাহিত্যের একটি মাষ্টারপিস্ বলে গণ্য হত।" ('ফরাসি সাহিত্যের বর্ণ পরিচয়')। মোলিয়ের, উগো, ফ্লোবেঅর, দোদে, মোপাসাঁ, গোতিয়ে, বের্গসঁ ও আনাতোল ফ্রাঁস-এর সঙ্গে সঙ্গে ভারতচন্দ্র প্রমথ-মানসের একাংশে ঠাঁই নিয়েছেন জীবনদর্শনের চিন্তাসমতার জোরে। আর এখানেই, প্রমথ-মানসের স্পষ্ট রূপটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

॥ ৮ ॥

প্রমথ চৌধুরী 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে (১৯১৫) কবিতারচনা যে আর্ট এবং তা যে সাধনালব্ধ, এই সত্যটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন এবং ইঙ্গিত করেছিলেন, বাংলা কাব্য তা রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে (মানসী-সোনার তরী পর্বে) পেয়েছে। বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে (১৮৯৪) এই বিষয় সম্পর্কেই মন্তব্য করেছিলেন—

'বর্তমান সমালোচক এককালে বঙ্গসুন্দরী ও সারদামঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য-শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য হইয়াছে বলা যায় না, কিন্তু এই শিক্ষাটি স্থায়ীভাবে হৃদযে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ভাষা কাব্যসৌন্দর্যের একটি প্রধান অঙ্গ; ছন্দে এবং ভাষায় সবপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।'

'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' প্রবন্ধে এই কথাকেই ঘুরিয়ে বলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী—

'প্রচ্ছন্ন মূর্তি ও পরিচ্ছিন্ন মূর্তি এক রূপ নয়, ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ, একথা আমি স্বীকার করি কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।'

হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের কবিতা সম্পর্কে তিনি কটাক্ষ করেছিলেন—

'মনের ভাবকে গড়ে না তুলতে পারলে তা মূর্তিধারণ করেনা আর যার মূর্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে; মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দ মিলের কাজ থাকা চাই।'

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যজিজ্ঞাসায় দুটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে—রূপসচেতনতা ও আনন্দসৃষ্টি।

'বাংলা কাদম্বরী' প্রবন্ধে (পরিচয়, মাঘ ১৩৪৪) তিনি বাণভট্টকে আর্টিস্ট বা রূপশিল্পীরূপেই দেখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, আর্টিস্ট হিশেবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব রমণীরূপবর্ণনায়। 'বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকের real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি। ......এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।' সে কারণে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে কাদম্বরী কথাকাব্যের উপেক্ষিতা পত্রলেখাকে সম্বোধন করে বলেছেন: 'অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছো পত্রলেখা।'

প্রমথ চৌধুরীর মতে সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণ, লোকশিক্ষা বা নীতিপ্রচার নয়, আনন্দসৃষ্টি। বঙ্কিমের সমাজকল্যাণাদর্শে তাঁর পুরো অবিশ্বাস। 'সাহিত্যে খেলা' প্রবন্ধে এই ব্যক্তব্যটি প্রমথ চৌধুরী সযত্নে ব্যাখ্যা করেছেন।

আর একটি প্রসঙ্গ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার আলোচনা ভ্রান্ত মতাদর্শ বলে তিনি মনে করেন। সাহিত্যে

নীতির প্রশ্ন অবান্তর বলে তাঁর ধারণা। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অশ্লীলতাকে অবশ্যই দোষ বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে অশ্লীলতার অর্থ গ্রাম্য বা indecent। এ হল দণ্ডীর মত। সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে অশ্লীলতা দোষ কাব্যদেহের দোষ, অপর কোনো বস্তুর নয়। তাঁদের বিচার পোয়েটিকস্-এর অন্তর্ভূত, এথিকস্-এর নয়।' (কাব্যে অশ্লীলতা—আলংকারিক মত)। বামন প্রমুখ আলংকারিকেরা বলেন, গ্রাম্যতা হচ্ছে শব্দের দোষ। শব্দব্যবহারে দুষ্টতা বা গ্রাম্যতাই অশ্লীলতা। বামনের এই কথাটি অলংকারশাস্ত্রের শেষ কথা বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করেন—'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী'— যে কথা শুনে মনে লজ্জা ঘৃণা অথবা অমঙ্গলের আশংকা উদয় হয়, সেই কাব্যই অশ্লীল। "কাব্য মীমাংসার ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকরা ছিলেন beauty-র অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utility-র ভক্ত।" এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন এবং আমাদের এই উপলব্ধিতে ফিরে যেতে বলেছেন। নীতিবিচার ছেড়ে দিয়ে ইসথেটিক ইমোশনকে আশ্রয় করার পরামর্শ তিনি বাঙালিকে দিয়েছিলেন।

কাব্যে utility-র কি কোনো ঠাঁই নেই? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, না। তাঁর মতে "মানবমনের প্রীতিসাধনই কাব্যের একমাত্র utility", "কাব্যের আবেদন মানুষের moral sense-এর কাছে নয়, spiritual sense-এর কাছে", "জীবনে যা ক্ষণিকের, তাকেই মনোজগতে চিরদিনের করবার কৌশলের নামই আর্ট।"

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এইসব উক্তি করেছিলেন ('চিত্রাঙ্গদা,' চৈত্র ১৩৩৪/১৯২৭/সবুজপত্র)। প্রমথ চৌধুরীর শিল্পজিজ্ঞাসার পরিচায়ক রূপে এইসব মন্তব্যকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ইসথেটিক ইমোশনজাত আনন্দ, তাঁর কাছে, কাব্যচর্চার পরাকাষ্ঠা।

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যাদর্শের আলোচনা আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে, তিনি প্রাণের—তারুণ্যের ও যৌবনের উপাসক, সুরুচির ভক্ত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের উপাসক, সামাজিক মিথ্যার শত্রু, পেগান, সৌন্দর্যের ভক্ত, সাহিত্যের স্বনির্ভর মর্যাদার সমর্থক এবং সর্বপ্রকার নীতিশাসনের বিরোধী।

১০ | প্রমথ চৌধুরীর রূপচেতনা

বাংলা-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর ইতিহাস-স্বীকৃত আবির্ভাব নানা কারণেই স্মরণযোগ্য। তিনি যে কেবল মোহমুক্তির সাধনা ও মুক্তবুদ্ধির উপাসনা করেছিলেন, তা নয়; তিনি মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন এবং দেশব্যাপী জাড্য ও তামসিকতার নির্বাসন দাবি করেছিলেন। বস্তুত, প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতা এদেশী ঐতিহ্যানুসারী মানসিকতা নয়। তা ইওরোপের—বিশেষ করে ফরাসি মানসিকতা। সেজন্যই তিনি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষের ভক্ত ছিলেন এবং অপ্রত্যক্ষ ও অস্পষ্টের বিরোধী ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে এইসব গুণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আরেক দিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর মানসিকতার স্বরূপ সন্ধান করা সম্ভবপর। তা হল, তাঁর প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের সাধনা। প্রমথ চৌধুরীর শিল্পিজীবনের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়।

জীবনের প্রথম পর্বের দুটি ঘটনা প্রমথ চৌধুরীকে রূপ-সচেতন করে তুলেছিল। 'আত্মকথা'য় (১৯৪৬) তিনি স্বীকার করেছেন অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরী এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এর মূলে আছে। তিনি বলেছেন: "দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবন ও মনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে সব নূতন লেখকের বই (বিলেত থেকে) নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্বে কখনো তাদের নাম শুনিনি,—যথা, রসেটি ও সুইনবর্ন প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে Pre-Raphaelite art-এর সঙ্গে পরিচিত হই। দাদার বাড়ীর আবহাওয়া aesthetic ছিল।" দাদার বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এই রূপচেতনার দ্বিতীয় কারণ। "পূর্বেই বলেছি যে, রূপজ্ঞানে আমি বঞ্চিত ছিলুম না। যে রূপ চোখে দেখা যায় সে রূপের আমি চিরকালই অনুরাগী ছিলুম। এবং এই ঠাকুর-পরিবারের তুল্য সুন্দর স্ত্রী-পুরুষ আমি অন্য কোন পরিবারে দেখিনি। যে রূপ শ্রোত্র-রসায়ন, সে রূপেরও এরা সম্যক্ চর্চা

করতেন।'' আর তৃতীয় কারণ—তাঁর ফরাসি সাহিত্য-প্রীতি। এই প্রীতির পরিচয় তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

এই ইন্দ্রিয়নির্ভর রূপ-সচেতনার প্রমাণ পাই প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে, গল্পে, কবিতায়। ভারতবর্ষ যে প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের চর্চা করত, তার নানা প্রমাণ উদ্ধার করে তিনি এ-কথাই বলতে চেয়েছেন, একে অস্বীকার করার অর্থ জীবনকে অস্বীকার করা। অধুনা আমরা রূপের চর্চা ত্যাগ করে, হয় অ-বাস্তব ধোঁয়াটে অ-রূপের ব্যর্থ সন্ধান করি, অথবা, কামের পঙ্কে ডুব দিই। এ দুই-ই পরিত্যাজ্য। তাঁর কাছে রূপের সাধনাই আলোর সাধনা; একেই তিনি বলেছেন যৌবনের সাধনা, অন্য কথায় তা জীবনের সাধনা।

আমাদের রূপান্ধতার জন্য প্রমথ চৌধুরীর খেদের অন্ত নেই। আমরা ব্যাবহারিক জীবনে রং-ছুট গান-ছুট বলে তিনি অনেকবার দুঃখ করেছেন। আমরা বিদেশি সাহিত্য যতটা বুঝি বিদেশি আর্ট ততটা বুঝি না,—এ সত্য আমরা মুখে স্বীকার না করলেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। কলা বা আর্টের উপকরণ আসে বাহ্য জগৎ হতে। বাহ্য জগতে এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের মিল নেই, দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্য কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সংকীর্ণ। কলার উপকরণের বিশেষত্ব হতে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। সুতরাং আর্টের দেশ কাল আছে, জাতিভেদ আছে। তার ফলে আমরা বিদেশি আর্টের কিছুই বুঝি না।

প্রমথ চৌধুরী আমাদের রূপ, রূপজ্ঞান সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান দিতে চেয়েছেন। খুব সংক্ষেপে তিনি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছেন—

'বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্য জগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আর্টেরও বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-ময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম এস্‌থেটিকাল কোয়ালিটি, অর্থাৎ 'রূপ'; এবং মনের সেই সুখলাভ করবার ক্ষমতার নাম এস্‌থেটিক ফ্যাকাল্‌টি অর্থাৎ 'রূপজ্ঞান'।' ['তেল নুন লকড়ি' ফাল্গুন ১৩১২]

আমাদের রূপান্ধতার হাস্যকর পরিচয় এ প্রবন্ধেই প্রমথ চৌধুরী দিয়েছেন। দুটি উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করি :

'আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনি নে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তাদেরই হস্তরচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে সুখী না হই, খুশি থাকি।'

'প্রায়ই দেখতে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের 'গা' থেকে 'পা'র প্রভেদ ধরতে পারেন না, তিনিই বাঁঠোফেনের প্রধান সমঝদার এবং যিনি রংটা নীল কিংবা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বলতে অপারগ, তিনিই টিশিয়ানের চিত্রে মুগ্ধ।'

। ২ ॥

এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব বক্তব্য পুরোপুরি পাই 'রূপের কথা'য় (ফাল্গুন ১৩২৩)। এ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "বাঙালি বৃথা গর্ব করে তারা অধ্যাত্মজ্ঞানী বৈরাগী, আসলে তারা রূপান্ধ।" রূপান্ধতার অপর নাম জীবন-অস্বীকৃতি। এখানেই তাঁর প্রবল আপত্তি। আমাদের দেশে রূপ জিনিসটাকে অনেকে পাপ মনে করেন। চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, তাঁরা রূপের বিকৃত অর্থ করে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে।

রূপান্ধদের প্রতিবাদ করে তিনি এই প্রবন্ধে বলেছেন : "বস্তুর রূপ বলে যে একটি ধর্ম আছে - এ হচ্ছে, শোনা কথা নয়, দেখা জিনিস। যাঁর চোখ-নামক ইন্দ্রিয় আছে তিনি কখনো-না-কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে ; সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের ছাড়া, যারা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান শুরু করেন। কিন্তু আমি এই জিনিসটাকে অতিবর্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখতে চাই ; কেনন অতীন্দ্রিয় জগতের রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।"

প্রাচীন গ্রীস, ইতালি, ভারত, বর্তমান ইওরোপ, চীন, জাপান—সর্বত্রই এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আদর ছিল ও আছে। আজকে একে আমরা অস্বীকার করে জীবন-বিমুখিতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছি।

সভ্যতার সঙ্গে সুন্দরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, আছে ও থাকবে : দৃঢ়কণ্ঠে এ কথা চৌধুরী মহাশয় ঘোষণা করেছেন 'রূপের কথা' প্রবন্ধে।

এরপর সংস্কৃত সাহিত্য ও চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণবসাহিত্যের কথা উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, দু ক্ষেত্রেই রূপের আদর ছিল। "আমরা যাকে সংস্কৃত কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই ; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষতঃ রমণীদেহের বর্ণনা, কেননা সে কাব্য-সাহিত্যে যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে তাও বস্তুতঃ রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁহারা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন।" পুনশ্চ, "আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন ; শুধু স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এ দেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন।" পুনরপি "আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় সেইদিনই বাঙালি সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়।"

এই তিনটি মন্তব্যের মধ্য দিয়ে যে প্রমথ চৌধুরীকে পাই, তিনি রূপের পূজারী—রূপচর্চাতেই জীবনের আনন্দ পেয়েছেন। কেন তিনি ইন্দ্রিয়জ রূপকে এত প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, "ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন ; কেননা ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম।" এখানে আমরা প্রি-র‍্যাফেলিট কবিগোষ্ঠী ও ফরাসি সাহিত্যের ভক্ত প্রমথ চৌধুরীকে আবিষ্কার করতে পারি।

কেন আমরা রূপের চর্চা করব ? কেননা, "রূপজ্ঞানের প্রসঙ্গে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সমাজের গোড়ার কথা হলেও, সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।"

সুন্দরের চর্চা তাই প্রমথ চৌধুরীর মতে সভ্যসমাজের চরমকীর্তি। এ থেকে যে বঞ্চিত, সে দুর্ভাগা। এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে তিনি বাঙালিকে বাঁচাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের

অধিবাসী ; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।··আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে, তা হলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়।" [রূপের কথা']

রূপতান্ত্রিক প্রমথ চৌধুরীর সৌন্দর্যদর্শন তথা জীবনদর্শনের এই সার প্রমথ-মানসের এক নোতুন পরিচয় পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত করে দেয়। প্রবন্ধাবলীতে যেখানেই তিনি জীবনের বা সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেখানেই তিনি এই রূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজজীবনে রূপের চর্চা থেকে তিনি সাহিত্যে রূপচর্চাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি, রূপের অদ্বয় মূর্তির উপসনাই করেছেন।

এই প্রখর সৌন্দর্যচেতনা, রূপজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাই 'জয়দেব', 'ভারতচন্দ্র', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বাংলার কাদম্বরী', 'সবুজপত্র', 'বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ' প্রভৃতি প্রবন্ধে। সতর্ক পাঠক এগুলি থেকেই চৌধুরী মহাশয়ের এই রূপচেতনার পরিচয় পেতে পারবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরী কী ভাবে সে সাহিত্যের রূপসায়রে ডুব দিয়ে মণিমাণিক্য আহরণ করেছেন, তার সুন্দর পরিচয় পাই 'বাংলার কাদম্বরী' শীর্ষক সমালোচনা-প্রবন্ধে (পরিচয়' মাঘ ১৩৪৩)। বাণভট্টের যে কৃতিত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করেছে, সে আলোচনাতেই তাঁর রূপচিন্তার তত্ত্বটি পাই। কাদম্বরী কথাকাব্য বাণভট্ট একটি উজ্জ্বল মাল্য রচনা করেছেন, তাতে লাবণ্যের ঢেউ খেলে যায়ঃ এ কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি। 'কাদম্বরী'তে landscape ও portrait painting-এর উৎকর্ষ চৌধুরী মহাশয় লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি বাণভট্টকে 'রূপশিল্পী' বলেছেন। "আর্টিষ্ট হিসাবে বাণভট্টের চরম কৃতিত্ব হচ্ছে রমণীর রূপবর্ণনায়। তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ও দেখিয়েছেন—সে হচ্ছে Dream of Fair Women। ইংরেজ কবি Tennyson-এর কবিতায় fair women-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না এবং তিনি কোনো সুন্দরীর স্বপ্ন দেখেন নি। তিনি ইতিহাস ও কাব্যের পাতার অন্তর থেকে প্রসিদ্ধ নারীদের উদ্ধার করতে চেষ্টা করেছেন। সুতরাং এদের নাম আছে, কিন্তু রূপ নেই। Helen একটি মর্মরমূর্তি ও Cleopatra-র চোখ কালো। এর বেশি কিছু নয়। বাণভট্টের সুন্দরীরা রূপলোকের real। তিনি তাঁদের শুধু রূপ দেখেছেন, দেহ নিয়ে টানাটানি করেন নি।" বাণভট্ট

কেবল রূপের পূজারী। প্রমথ চৌধুরী তাই আর্টিষ্ট বাণভট্টকে নমস্কার করেছেন, "কেননা এ রূপ নিত্য অথচ বস্তুভিত্তিক, এই রূপ হচ্ছে reality-র পরাকাষ্ঠা।" অথচ এ সৌন্দর্য "সত্যনারীর অতিরিক্ত সৌন্দর্য"। কাদম্বরী কথাকাব্যের তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী পত্রলেখা নিত্যরূপলোকের অধিবাসিনী। তাই তাকে দেখে চৌধুরী মহাশয় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন,—"অষ্টাদশ বর্ষদেশে আছো পত্রলেখা।" তার ক্ষয় নেই, বার্ধক্য নেই, সে রূপলোকের প্রতিমা, আর সে প্রতিমার নির্মাতা রূপশিল্পী বাণভট্ট। এখানেই প্রমথ চৌধুরীর রূপানুভূতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই রূপানুভূতি আরো স্পষ্ট হয়েছে 'জয়দেব' ও 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধ দুটিতে। দুটি প্রবন্ধেই প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেছেন, এঁরা দুজন সব সময় শ্লীলতার গণ্ডী রক্ষা করেন নি। কিন্তু তিনি জয়দেবের তীব্র নিন্দা ও ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। জয়দেব যে কামলোকের কবি, রূপলোকের নন, তা উক্ত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় দেখিয়েছেন। গীতগোবিন্দ যে কেবল "বিলাস-কলাকুতূহল" কথা, সে কাব্যে যে কেবল দেহসর্বস্ব নির্লজ্জা রাধিকাপ্রমুখ গোপযুবতীদের বর্ণনা আছে এবং সেখানে যে রমণীর রূপবর্ণনার অভাব এবং কামবর্ণনার প্রাবল্য, তাই চৌধুরী মহাশয়কে জয়দেবের প্রতি বিমুখ করেছে। আর 'ভারতচন্দ্র' প্রবন্ধে দেখি আর্টিষ্ট ভারতচন্দ্রের উচ্চ প্রশংসা। "ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর art আছে, অপরের আছে শুধু nature"। জয়দেব সেই অপর কবি, তাই তিনি নিন্দিত। জীবনের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা, দৈবদুর্বিপাক, দারিদ্র্য ভারতচন্দ্রকে নিরানন্দ করতে পারে নি, করেছিল শুধু "প্রমোদের প্রভু"। "এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যাবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিষ্টের মন সকল দেশেই সংসারে নির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয়বাসনায় আবদ্ধ নয়।" এই দুই প্রবন্ধে দেখি, চৌধুরী মহাশয় আর্টকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। সেইজন্য তিনি জয়দেবের নিন্দা ও ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করেন। হীরা মালিনী ও সুন্দর কামলোকের নয়, রূপলোকের অধিবাসী, তাই তারা অমর, একথাই প্রমথ চৌধুরী আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন।

যেখানেই কামলোকের উপরে রূপলোকের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সেখানেই প্রমথ চৌধুরী কবির সমর্থনে এগিয়েছেন। যে রূপ সাংসারিক প্রয়োজনে

লাগে না, কামচারিতায় আবদ্ধ হয় না, সংসারের শাসনকে অগ্রাহ্য করে, তিনি তারই সমর্থন করেছেন। তাই শ্লীলতা অশ্লীলতা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, আর্টের উপস্থিতিই তাঁর কাছে বড় কথা। এই জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য অবলম্বনে লিখিত 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ (চৈত্র ১৩২৪)।

'চিত্রাঙ্গদা প্রবন্ধেও প্রমথ চৌধুরী 'রূপের কথা' প্রবন্ধে উল্লিখিত রূপলোক ও কামলোকের কথা তুলেছেন এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের স্থান কোন্ লোকে, তা বিচার করেছেন। তিনি বলেছেন: "বৌদ্ধরা বিশ্বাস করতেন যে, কামলোকের উপরে রূপলোক বলে আর একটি লোক আছে। যে ব্যক্তি তাঁর বর্ণিত বিষয়কে কামলোক থেকে রূপলোকে তুলতে পারেন তিনিই যথার্থ কবি। চিত্রাঙ্গদা যে রূপলোকের বস্তু, কামলোকের নয়, তা যাঁর অন্তরে চোখ আছে তিনিই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। যাঁদের তা নেই, অর্থাৎ যাঁরা অন্ধ, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করাই বৃথা।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী এটাই প্রমাণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ রূপলোক সৃষ্টি করেছেন এবং চিত্রাঙ্গদা সেই রূপলোকের প্রতিমা, সে রূপলোকের real। জয়দেব তা পারেন নি বলেই ব্যর্থ হয়েছেন।

এই রূপলোক রবীন্দ্রনাথ কী কৌশলে সৃষ্টি করেছেন তা প্রমথ চৌধুরী নিপুণভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। "চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্ন মাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্যসুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন। এ চিত্রাঙ্গদা সেকালের মণিপুরের রাজকন্যা নন, সবকালের মানুষের মনপুরীর রাজরানী, হৃদয়নাটকের রত্নপাত্রী। আমরা যাকে আর্ট বলি তা হচ্ছে মানবমনের জাগ্রত স্বপ্নকে হয় রেখায় ও বর্ণে, নয় সুরে ও ছন্দে, নয় ভাষায় ও ভাবে আবদ্ধ করবার কৌশল ও শক্তি।" রবীন্দ্রনাথ সেই শক্তির অধিকারী বলেই তিনি কালিদাসের সমগোত্রীয় কবি ও পূর্ণ আর্টিষ্ট। "মানুষমাত্রই বাস করে কতকটা কর্মজগতে আর কতকটা স্বপ্নলোকে। এই স্বপ্নকে যাঁরা সম্পূর্ণ সাকার করে তুলতে পারেন অর্থাৎ সমগ্র ও পরিচ্ছিন্ন রূপ দিতে পারেন, তাঁরাই হচ্ছেন পূর্ণ আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্য মানুষের যৌবনস্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।"

এই অপূর্ব যৌবনস্বপ্নের কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিচয় দিতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী পুনর্বার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন: "কোন

কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা ঢের সহজ, কেননা দেহ জিনিসটে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও পরিচ্ছিন্ন।" ভাবের দেহ ভাষা, তাই তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের ভাষার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের আলোচনার মাধ্যমে "যৌবনস্বপ্নের রাগিণী চিত্রাঙ্গদা"র পরিচয় উপস্থিত করেছেন। চিত্রাঙ্গদার কাব্যশরীরের লোকোত্তর রূপলাবণ্য কতটা ফুটে উঠেছে, তার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি কয়েকটি চরণ উদ্ধার করেছেন, এখানেই রূপবিলাসী সমালোচকের দেখা পাই :

যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের
পিতৃমাতৃহীন ফুল, শুধু একবেলা
পরমায়ু—তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনান্তের
আনন্দমর্মর, পরে নীলাম্বর হতে
ধীরে নামাইয়া আঁখি, নুয়াইয়া গ্রীবা
টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে
কুসুমকাহিনীখানি আদি-অন্ত-হারা।

[চিত্রাঙ্গদার উক্তি]

এই রূপচেতনার স্পষ্ট পরিচয় পাই 'সবুজপত্র' প্রবন্ধে। মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী—সবুজ রং যে প্রাণের রং, এ তত্ত্বটি বোঝাতে গিয়ে বর্ণভাণ্ডের সমস্ত রং উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। প্রকৃতিতে কত যে রং ফুটে ওঠে প্রাণের স্পর্শে, তা চক্ষুষ্মান সজাগ লেখকের বর্ণালিম্পনে ধরা পড়েছে। সবুজ রঙের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে লেখক বলেছেন: "বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পূর্বরাগের রং ; লাল রক্তের রং, জীবনের পূর্ণরাগের রং ; নীল আকাশের রং, অনন্তের রং ; পীত শুষ্ক পত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীনপত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্বসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম।…সবুজের মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার

থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল, কখনো কোমল করে তুলবে।"

প্রমথ চৌধুরী যে প্রি-র‍্যাফেলিট ছবি ও কবিতার অনুরাগী ছিলেন, তার পরিচয় এখানে পাই। বর্ণভাণ্ড নিঃশেষ করে নৈপুণ্যের বর্ণালিম্পন-অংকনের দুরূহ শিল্পবিদ্যা তাঁর আয়ত্তে ছিল, এ বর্ণনা তার প্রমাণ। এর পেছনে রয়েছে একটি অতন্দ্র প্রখর ইন্দ্রিয়-সচেতন রূপাশ্রয়ক শিল্পীমন।

রূপের উৎস ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান, আর কবিকল্পনার ভিত্তি বস্তুজ্ঞান, এ কথা তিনি বিশ্বাস করতেন: 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ' (আশ্বিন ১৯২০) প্রবন্ধের শেষ দুটি অনুচ্ছেদে তিনি এটি স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। সৌন্দর্যের দর্শনলাভের জন্য শিবনেত্র হবার প্রয়োজন নেই, বরং চোখ খোলা রেখে বাহ্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে দুটি নয়ন মেলে দেখাই যথার্থ সৌন্দর্যদর্শন।

॥ ৩ ॥

এই ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানভিত্তিক রূপজ্ঞানের পরিচয় স্পষ্টতর হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলিতে। 'চার-ইয়ারি কথা' ও অন্যান্য ছোট গল্পে নারীরূপের যে বর্ণনা পাই, তাতে এ ধারণাই সমর্থিত হয়। নারীরূপ-বর্ণনাতেও প্রমথীয় বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাংলা উপন্যাসের বাঁধাধরা বর্ণনা বর্জন করে তিনি নাম নয়, রূপের উপরেই জোর দিয়েছেন। রূপলোকের real-কে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ফলে তাঁর সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি দেশকালের গণ্ডীতে ধরা দেয় না। তাদের বর্ণনায় যে প্রত্যক্ষতা, ঋজুতা, ভাস্কর্য-সুলভ স্পষ্টতা, গ্রীসীয়সুলভ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা ও detail অংশের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তা চিরাচরিত নয়। অথচ এই বর্ণনা কোথাও সম্ভোগে আবিল নয়, তা রূপধ্যানে ভাস্বর। অতিস্পষ্ট প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণনা যে স্থূল বস্তুসর্বস্বতা ও পঙ্কিল যৌনলালসায় পরিণত হয় নি তার মূলে আছে প্রমথ চৌধুরীর অসাধারণ শিল্পসংযম। এই সব ক'টি গুণেরই পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়িয়ে আছে। তাঁর রমণীমূর্তিরা গ্রীক সৌন্দর্যজগতের অধিবাসিনী। রং-রেখার অ-সাধারণ প্রয়োগের নমুনা তাঁর গল্প থেকে এখানে যদৃচ্ছ তুলে দিচ্ছি।

(ক) "চমৎকার দেখতে, একেবারে নীলপাথরের ভেনাস। তার গলায় ছিল লাল রঙের পুঁতির মালা, দু কাণে দুটি বড় বড় প্রবাল গোঁজা আর ডান হাতের কব্জায় একটি পুরু শাঁখার বালা। মাথার বাঁদিকে চূড়ো বাঁধা ছিল, আর পরণে এক চওড়া লাল পাড়ের সাদা শাড়ী।" [ভূতের গল্প]

(খ) "সেই গ্রীসীয়ান নাক, সেই ভায়োলেট চোখ। আর সেই ঠোঁটচাপা হাসি, যার ভিতর আছে শুধু যাদু" [দেবি ফিসমাস]

(গ) "যা দেখলুম তাতে মনে হল সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়—শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্তি, তার সকল অঙ্গ-দেবতার মতই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্বিকার।" [একটি সাদা গল্প]

(ঘ) "সেখানে গিয়ে দেখি, যিনি একটি রাঙ্কব আসনে উপাবিষ্ট আছেন, তিনি স্বয়ং সরস্বতী, তন্বী, গৌরী, বিগাঢ়-যৌবনা, শ্বেত-বসনা।" [বীণ বাই]

(ঙ) "তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনী প্রতিমার মত ছিল এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কাণ তোলা তাঁর চোখ দুটি, দেবতার চোখের মত স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনও পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতর যা জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারিপাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা।" [আহুতি]

(চ) "সে আপাদমস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, আর আঙুলের ডগা দিয়ে অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। Leyden jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চলত, তা হলে ঐ কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বলতে গেলে প্রাণের চেহারা তার চোখ মুখ, তার অঙ্গভঙ্গী তার বেশভূষা সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরুচ্ছিল।" [ছোট গল্প]

(ছ) "তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল—সে মূর্তি যেমন সুন্দর, তেমনি কঠিন।" [চার-ইয়ারী কথা]

(জ) "এই রমণীটির শরীরের গড়ন ও চলার ভঙ্গীতে শিকারি-চিতার মত একটা লিক্‌লিকে ভাব আছে।" [তদেব]

(ঝ) "দেখি, সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে, এ হাসি তার মুখের নয়—চোখের। ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে হাসি ছুরির ধারের মত চিক্‌চিক্ করছে।" [তদেব]

(ঞ) "আমার চেহারা ঠিক Botticelli-এর ছবির মত হয়েছিল। হাত-পাগুলি সরু সরু, আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখ দুটি বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল, তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতীর দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত, তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠত।" [তদেব]

(ট) "দেখি কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল, এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে,—একটি গভীর বিষাদের রঙ তা স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে উঠেছে,—এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর কখনও দেখিনি।" [তদেব]

আশা করি, উপরিধৃত উদ্ধৃতগুলি এ কথার প্রমাণ দেবে যে, প্রমথ চৌধুরী-সৃষ্ট রমণীরা গ্রীকসৌন্দর্যের অধিবাসিনী; তারা কামলোকের নয়, রূপলোকের। এই সৃষ্টির পিছনে রয়েছে একটি অনন্দ ইন্দ্রিয়সচেতন প্রত্যক্ষ বস্তুজ্ঞানসমৃদ্ধ শিল্পীমন। এখানে প্রমথ চৌধুরী ক্লাসিকাল যুগের পথিক।

কেবল নারীরূপবর্ণনায় নয়, প্রকৃতিচিত্রণেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 'চার-ইয়ারী কথা'র সূচনায় যে তামসী-বর্ণনা, তা চিরাচরিত প্রথানুবর্তন নয়। সেখানে দেখি, "এ যেন আর এক পৃথিবীর আর এক আকাশ; দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথাও ঘনঘটা করে নেই, আশেপাশে কোথাও মেঘের চাপ নেই, মনে হল কে যেন সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে, এবং সে রং কালোও নয় ঘনও নয়; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে রকম আলো দেখা যায়, সেই রকম আলো। আকাশজোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত, স্তম্ভিত, মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি,—গাছপালা, বাড়ী-ঘর-দোর সব যেন কোন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে

আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে।" অন্ধ তামসীরাত্রির uncanny feeling সৃষ্টি করতে এ বর্ণনা সাফল্যলাভ করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার যেখানে উজ্জ্বলবর্ণের সমারোহ, সেখানেও অনুরূপ সাফল্যের পরিচয় পাই; যেমন, এই গ্রন্থের—মাথার উপরে সোনার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখমলের গালিচা, চোখের সুমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলের জহরৎ-খচিত গাছপালা—সে পুষ্পরত্নের কোনটি বা সাদা, কোনটি বা গোলাপি, কোনটি বা বেগুনি।" রঙে রেখায় প্রমথ চৌধুরী যে স্পষ্টতা ও প্রত্যক্ষতার ভক্ত ছিলেন, তার প্রমাণ এখানে পাই। বাণভট্টের শিল্পগুণ-আবিষ্কারে যত্নবান যে সমালোচক, তিনি এখানে সৃষ্টিকর্মে নিযুক্ত। শিল্পজ্ঞান ও শিল্পসৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা প্রবন্ধে ও গল্পে স্বতঃই প্রমাণিত।

॥ ৪ ॥

এই রূপচেতনতার পরিচয় প্রমথ চৌধুরীর কবিতা-সংকলন দুটিতে—'সনেট-পঞ্চাশৎ' ও 'পদ-চারণ'-এও পাই। যে স্পর্ধিত স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় গল্পে ও প্রবন্ধে বর্তমান, তা এখানেও উপস্থিত। সেই প্রখর সৌন্দর্যচেতনা, প্রবল রূপতৃষ্ণা, গভীর আনুপূর্বিক বর্ণনার প্রতি ঝোঁক, সংহত প্রস্তর-কঠিন মসৃণ লাবণ্য, ভাস্কর্যসুলভ শিল্পনৈপুণ্য কবিতায় বর্তমান। সনেটকে প্রমথ চৌধুরী 'বিগাঢ়যৌবনা তন্বী' বলে সম্বোধন করেছেন; তাঁর শিল্প-প্রতিমাই তা-ই। এই প্রত্যক্ষ রূপচেতনার ভিত্তিতে নির্মিত যে কাব্যপ্রতিমা, তার সার্থক বর্ণনা পাই 'প্রতিমা' সনেটটিতে:

> "প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে'।
> আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
> এনেছি তারার মত জ্যোতির্ময় মণি,—
> রত্ন দিয়ে দেবীমূর্তি গড়িবার তরে।
> স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে,'
> পরায়েছি শ্যাম-শাটী মরকতে বুনি,
> রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
> বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।

প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব সুন্দর মূর্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জন।"

রোমান্টিক কাব্যসংসারে প্রমথ চৌধুরী ক্লাসিকাল কাব্যপ্রতিমাস্থাপনে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং গ্রীক ভাস্কর্যের আধারে যে প্রতিমাকে খোদাই করেছিলেন, এই সনেটে তারই পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কাব্যজীবনে সাফল্য-অসাফল্যের প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও একথা এখানে অবশ্যস্বীকার্য যে, প্রখর রূপচেতনাই জয়লাভ করেছে এবং চুনি-পান্না-মুক্তা-প্রবাল-হীরক-কঠিন দীপ্তিতে সে প্রতিমা উদ্ভাসিত হয়েছে।

'বসন্তসেনা' 'পত্রলেখা' 'তাজমহল' প্রভৃতি সনেটে পুরাণ-ইতিহাস-প্রোক্ত সুন্দরীর বর্ণনায় অথবা 'ধুতুরার ফুল', 'কাঁঠালি-চাঁপা', 'করবী', 'কাঠ-মল্লিকা' প্রমুখ সনেটে এই স্বতন্ত্র বিশিষ্ট প্রখর রূপচেতনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। বর্ণালিম্পনের প্রয়োগনৈপুণ্যে এই সনেটগুলিতে রূপচিত্র প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ লাভ করেছে, তা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। দারজিলিঙে চেরি-পুষ্প দেখে তিনি যে সনেটটি লিখেছেন [চেরিপুষ্প, পদ-চারণ], তাতে এই বৈশিষ্ট্য অতি স্পষ্ট :

বসন্তের আগমনে আজও আছে দেরি,
পর্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
শাখামুখে ফুটিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছে ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুসুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রণভেরী।
মর্মর-কঠিন শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,

শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে।

প্রমথ চৌধুরী যে প্রি-র‍্যাফেলিট ছবি ও কবিগোষ্ঠীর অনুরাগী ছিলেন, তার প্রমাণ পাই এখানে। সুইনবর্ন, মরিস ও ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতায় যে চিত্রলোক, রূপলোক, স্বপ্নলোকের দেখা পাই, তারই চকিত আভাস পাই উল্লিখিত সনেটগুলিতে। বর্ণলিম্পনে ও চিত্রাংকনে সেই নৈপুণ্য, গ্রীসীয় রূপলোকের প্রতি সেই আসক্তি, প্রত্যক্ষ রূপচেতনার সেই প্রাধান্য এখানে বর্তমান। তাই প্রমথ চৌধুরী কামলোকের নন, তিনি রূপলোকের কবি। বাংলা কাব্যসংসারে তিনি নিঃসঙ্গ পথিক—যিনি বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের পূজারী।

১১ | প্রমথ চৌধুরী ও বাংলার চাষী

আধুনিক মনীষার লক্ষণ হচ্ছে চিন্তার বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা। একালের মনীষীরা সচেতনভাবে মানুষের সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করে থাকেন। আপন দেশকালের ফ্রেমে বাঁধা মানুষের বোধবিশ্বাস, জাতীয় উৎস, আর্থিক সমস্যা, নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান—সর্ব বিষয়েই তাঁরা সচেতনভাবে অনুশীলন করেন। আমাদের দুশো বছরের ইতিহাসে নানা বাধাবিপত্তির কারণে যে কুসংস্কার, অজ্ঞতা, যুক্তিহীনতা এখনও শিক্ষিত শ্রেণীকে অবনত রেখেছে, তার বিরুদ্ধে অভিযানে যেমন ঐতিহাসিক কার্যকারণ নির্দেশ ও প্রয়োগব্যবস্থার মূল্যবান, তেমনি এইসব মানসিক দেওয়াল ভেঙে ফেলতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের লেখা অধ্যয়নও যুক্তি ও বুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়। রামমোহন রায় থেকে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত বাঙালি মনীষার ধারায় এই দায়িত্বজ্ঞান, বুদ্ধির মুক্তির আহ্বান ও সমাজচেতনা বার বার লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার নবযুগের প্রকৃতিবিচারে আধুনিক বাঙালি মনীষীমাত্রেই আত্মনিয়োগ করেছেন। রামমোহন রায় থেকে বিনয়কুমার সরকার পর্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। বাংলার নবযুগের চরিত্র ইউরোপীয় নবযুগের থেকে স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নেই। এই স্বাতন্ত্র্যের বিশদ প্রকৃতি এখনও ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার অধীন। তবু বহিরঙ্গ বিচারে একথা বলা যায় যে, বাংলা তথা ভারতে এই নবযুগের প্রেরণা আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বন্দ্বে উদ্ভূত হয় নি, এর উদ্ভব বহিঃশক্তির অভিঘাতে—এদেশে ইংরেজ শাসন স্থাপনের প্রবল আঘাতে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় প্রাচীন আর্থিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে নোতুন পরিবেশ সৃষ্ট হবার ফলে, প্রাচীন চিন্তা ও মূল্যমানের যে পুনর্বিচার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তারই পরিণামফল বাংলার নবযুগ।

নবযুগের সমাজ লক্ষণ কী, এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। তথাপি দুটি

মূল বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা যায়—যুক্তিবাদিতা ও মানবিকতা। সত্যনির্ণয়ে আপ্তবাক্য, শাস্ত্রবাক্য বা দৈববাণীর উপর নির্ভর না করে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তার ভিত্তিতে যুক্তি-প্রয়োগের সাহায্য গ্রহণকে বলা যায় যুক্তিবাদিতা। ধর্ম, শ্রেণী বা স্ত্রী-পুরুষের ভেদ-নির্বিশেষে মানুষের মনুষ্য-মর্যাদার স্বীকৃতিকে বলি মানবিকতা। যে কোনো দেশে নবযুগের লক্ষণ বিচার করতে গিয়ে এদুটি বৈশিষ্ট্যের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

ভারতবর্ষের নবযুগ বিচারের পূর্বে বাঙালি মনীষীদের দৃষ্টি ইউরোপের নবযুগের উপর পড়েছিল। তার কারণ সহজেই অনুমেয়। আধুনিক ইউরোপ যে আধুনিক ভারতের ঘুম ভাঙিয়েছে, একথা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই স্বীকার করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম চিন্তানায়ক প্রমথ চৌধুরী ইউরোপের নবযুগকে বিচার করে যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা থেকে বাঙালি মনীষার সামান্য পরিচয় লাভ দুষ্কর নয়।

প্রমথ চৌধুরী প্রথমেই একটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন: কোনো সভ্যতাই অমূল তরু নয়, পূর্বতনের সঙ্গে সংযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ আবির্ভূত হয় নি। নবযুগ বিচারে এই সামগ্রিক পটভূমিটি একান্তই প্রয়োজন। সুখের বিষয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, সকলেই এসম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

প্রমথ চৌধুরীর সতর্কবাণী কিছু নোতুন কথা নয়, তবু সত্য পুনঃস্মর্তব্য:

"আমরা মানবসভ্যতাকে সচরাচর দুইভাগে বিভক্ত করি: প্রাচীন ও নবীন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনো বর্তমান সভ্যতা নেই যা অনেক অংশে প্রাচীন নয়। যেমন আমাদের বর্তমান সভ্যতা কিংবা অসভ্যতা এক অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর-এক অংশে নব্য ইউরোপীয়, তেমনি ইউরোপের বর্তমান সভ্যতা আট আনা নতুন হলেও আট আনা পুরনো।" ['বর্তমান সভ্যতা বনাম বর্তমান যুদ্ধ', অগ্রহায়ণ ১৩২১, প্রবন্ধ সংগ্রহ ২]

ইউরোপের নবযুগের সভ্যতায় মানুষ কী ভাবে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেল, পাশ্চাত্য নবযুগের রেখাচিত্র আঁকতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী সে-দিকে নজর রেখেছেন। এই প্রবন্ধে অতি সংক্ষেপে তিনি নবযুগের পরিচয় দিয়েছেন:

"মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙে পড়ে নি, মানবমনের একটির পর আর-একটি তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে,

সে তিন হচ্ছে ইতালির রেনেসাঁস্‌, জর্মানির রিফরমেশন এবং ফ্রান্সের রেভলিউশন।

গ্রীস রোমের প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শে ইতালি যদিন নবজীবন লাভ করলে সেইদিন ইউরোপে নবসভ্যতার সূত্রপাত হল। এই প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ নিজের শক্তি ও বাহিরের সৌন্দর্য আবিষ্কার করলে। মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখলে। মানুষের পক্ষে তার এই নব আবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত শক্তির চর্চাই তার প্রধান কর্তব্য হয়ে উঠল। যে প্রকৃতিকে ইউরোপীয়েরা হাজার বৎসর ধরে বিমাতা মনে করে আসছিল, তাকে তারা সেবাদাসীতে পরিণত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই নবজীবন শিল্পে, বিজ্ঞানে কাব্যে ইতিহাসে বিকশিত হয়ে উঠল। এককথায় নবজীবন লাভ করে মানুষের চোখ-কান ফুটল এবং হাত-পায়ের খিল খুলে গেল।

এর পরবর্তী যুগে জর্মানি বাইবেলের আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের অন্তরও আবিষ্কার করলে। মানুষে এই সত্যের পরিচয় পেলে যে, ধর্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্মযাজকের মুখে নয়। খৃস্টের ধর্মের পরিচয় লাভ করে মানুষে খৃস্টসংঘের সংস্কারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। জর্মানির এই নবসংস্কারের গুণে ইউরোপীয় মানবশক্তি আবার অন্তর্মুখী হল। মানুষ আত্মদর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল।

এই রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে মানুষের কর্মবুদ্ধি এবং এই রিফরমেশনের ফলে তার ধর্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করে, কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

তারপর ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় মানব মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে জীবনেও স্বাধীনতা লাভ করলে। সুতরাং ইউরোপের নবযুগের সভ্যতায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে, হারাল না।”

মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা নবযুগের প্রধান বাণী—এ সত্যটি এখানে পরিস্ফুট। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল বাঙালি চিন্তানায়ক এই সত্যকেই নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সকল আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের পুনর্বিচারের তাগিদ তাঁরা বোধ করেছেন এবং শ্রেণী বর্ণ স্ত্রী পুরুষ ভেদ-নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দিতে চেয়েছেন।

রামমোহনের রচনায় প্রাচীন চিন্তার পুনর্বিচার ও মানবিকতার বোধ অনায়াসলক্ষণীয়। নিম্নধৃত দুটি উদ্ধৃতি তার প্রমাণ।

ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে প্রাচীন প্রথার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা ত্যাগ করে যুক্তিপূর্ণ বিচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে রামমোহন লেখেন :

"এস্থানে এক আশ্চর্য এই যে অতি অল্পদিনের নিমিত্ত অতি অল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থ বিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতিমূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের কি যুক্তির দ্বারা বিচার করেন না, আপনার বংশের পরম্পরা মতে আর কেহ কেহ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাস দ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে।" [ঈশোপনিষৎ, জুলাই ১৮১৬, রামমোহন গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ পৃ ২০০]

এই যুক্তিবাদী সংশয়বাদী বিচারদৃষ্টি নবযুগের অন্যতম লক্ষণ।

রামমোহনের চিন্তায় মানবিকতাবোধের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। সমাজের অবহেলিত অংশ নারীর বাঁচার অধিকারের দাবিকে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন। বস্তুত সেদিন তা ছিল মানবিক অধিকারের প্রথম ধাপ। যথাবিহিত সহমরণের নিষ্ঠুর বিধানের তীব্র সমালোচনা করে' রামমোহন লিখেছিলেন :

"দেখ কি পর্যাপ্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা তাহারা (নারীরা) কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাত হয় না। অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার সাক্ষাৎ করেন···আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্য বর্ণের মধ্যে যাহারা আপন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন তাহারদের বাটিতে প্রায় স্ত্রীলোক কি দুর্গতি না পায়? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন···নীচ লোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায় তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ

ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহাদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহাদিগকে করে—অনেকেই ধর্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্নরূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহত্যাগ করে তবে রাজদ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই সেই পতি হস্তে আসিতে হয়, পতিও সেই পূর্বজাত ক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ……নানা দুঃখে দুঃখিনী তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" ['প্রবর্তক-নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', ১৮১৯, রামমোহন গ্রন্থাবলী তৃতীয় খণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৪৬-৪৭]

রামমোহনের পর দুজন প্রধান চিন্তানায়ক দেখা দিয়েছিলেন—অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। "অক্ষয় দত্তের চিন্তা ও রচনায় রামমোহন-কথিত 'যুক্তির বিচার' ও তারই পরিণতি হিসাবে যুক্তির নিরীখে শাস্ত্রের বিচার চোখে পড়ে এবং বিদ্যাসাগরের রচনা ও কার্যে রামমোহন-কথিত 'প্রত্যক্ষ সিদ্ধ' সামাজিক সত্যের উন্মোচন, এবং তারই ভিত্তিতে দেশাচারের বিরুদ্ধে ঐতিহ্যসন্ধানী 'শাস্ত্রের বিচার' দেখতে পাই। তাই উভয়েই যখন শেষকালে নিরীশ্বরবাদের প্রান্তরে এসে দাঁড়ালেন তখন একের প্রেরণা ছিল নিউটনের পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিতে গঠিত নিয়মনিবদ্ধ বিশ্বসৃষ্টি; অপরের মানসে ছিল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষে দেশের মানুষের দুর্দশাগ্রস্ত রূপ।" [বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা, ১৯৬৪, পৃ ৩৫, অজিতকুমার ভট্টাচার্য]

অক্ষয়কুমার জেনেছিলেন বিজ্ঞান-ই নবযুগের ধর্ম। তিনি লিখছিলেন, 'যে পরম ধর্ম সমুদায় মনুষ্যের মানসপটে ও সকল বাহ্য পদার্থের সর্বস্থানে অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, এই বিশ্বরূপ অভ্রান্ত গ্রন্থই যে ধর্মের সাক্ষী…যাহার প্রামাণ্য বিষয়ে লেশমাত্রও সংশয় নাই…এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্র··পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপ ··' [তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭১ শক, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৫০]

তারপর কর্তব্য বলে' অক্ষয়কুমার নির্দেশ করেছেন, 'তদীয় আলোচনা ও তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন'। এখানেই পদার্থবিজ্ঞানের জন্ম ঘোষিত হল। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক চিন্তার সর্বাপেক্ষা বড় কীর্তি, ব্রাহ্মসমাজকে

'বেদশৃঙ্খল' থেকে মুক্তি দান। 'ধর্মের মূল ভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না'—এই ধারণা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে আপ্তবাক্যের সিংহাসনচ্যুতি ও ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা বা অপৌরুষেয়তার অন্ত ঘোষিত হয়। পরিণত অক্ষয় দত্তের মত তাঁর 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের প্রথম ভাগের (১৮৭০) ভূমিকায় স্পষ্টভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়িক মতগুলিকে 'ভ্রান্তিভূধর আখ্যা দিয়ে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'বেকন, বেকন, ভারতবর্ষে একটি বেকনের প্রয়োজন হইয়াছিল। (দ্রষ্টব্য প্রাগুক্ত পুস্তক)

একই সময়ে 'প্রত্যক্ষ সিদ্ধ' সামাজিক জ্ঞানের বলে ও মানবিকতার প্রেরণায় বিদ্যাসাগর দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা মনে কর, পতি বিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়। দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না। দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ…হায় কি পরিতাপের বিষয়..দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই।' ['বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব', দ্বিতীয় পুস্তক, অক্টোবর ১৮৫৫, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ১৮৬-৮৭]

রামমোহনের মতই বিদ্যাসাগর দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার চেয়েছিলেন। বেদান্ত দর্শনকে ভ্রান্তি ও ক্ষতিকর বলেছিলেন। তদানীন্তন শিক্ষাসচিব মোয়াট সাহেবকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে এক পত্রে (৭ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩) বিদ্যাসাগর লেখেন:

'That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no longer a matter of dispute......It is not possible in all cases I fear that we shall be able to show real agreement between European Science and Hindu Shastras.'

রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও ব্যাবহারিক জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন, আপ্তবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করতে চান নি। বাংলার নবযুগ এঁদের চিন্তায় সাকার হয়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র এখান থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন। মানবিকতার অধিকার তিনিও সমর্থন করেছিলেন। একথা ঠিক যে তিনি বহুবিবাহ-নিরোধ-আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেন, যদিচ প্রথা হিসেবে বহুবিবাহ কাম্য, এ দাবি তিনি করেন নি। বিধবাবিবাহ সমর্থনেও তাঁর প্রবল কুণ্ঠা ছিল। এবং স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তায় স্ববিরোধিতা ছিল। নীতির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু আচার ও শাস্ত্রের সমালোচনা করেছেন কুণ্ঠাহীন নির্মমতার সঙ্গে, কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক প্রশ্নে শুধু প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন ও সম্প্রসারণেরই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এর ফলে তাঁর নৈতিক সমালোচনাও শেষ পর্যন্ত সামাজিক পশ্চাদপসরণের সমর্থনে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বকে তিনি সমার্থক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমের এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও স্ববিরোধিতার কারণ ঔপনিবেশিক পরিবেশে নিহিত। যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি সম্ভব, ঔপনিবেশিক ভারত তথা বাংলায় তা ছিল না বলেই চিন্তাক্ষেত্রে এই স্ববিরোধিতা দেখা গিয়েছিল। ইংরেজি-শিক্ষিত ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ ও সেই শ্রেণীর চিন্তাসংকটের প্রতীক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

তথাপি স্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র সচেতনভাবে তাঁর দেশের মানুষের, সমগ্র সামাজিক অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করেছিলেন। ভারতীয়দের বোধ বিশ্বাস, জাতীয় উৎস, আর্থিক সমস্যা এবং নৈতিক, আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান—সব বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন-ভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নবযুগের বাংলার অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক হতে পেরেছিলেন এই কারণে যে, তিনি সত্যনির্ধারণের জন্য ব্যক্তিবিবেচনা-সম্মত যুক্তি, বুদ্ধি বা তদনুরূপ কোনো বাস্তব মনের উপর নির্ভর করেছেন, শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্যের উপর নয়। তিনি কোনোদিনই শাস্ত্রের অভ্রান্ততাকে মেনে নেন নি—কখনই শাস্ত্রকে বা সাংখ্যের শব্দকে প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেন নি। পরিণত বয়সে বঙ্কিম ঘোষণা করেছিলেন,

'হিন্দুধর্মের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা তাহার মীমাংসা কে করিবে—কোন্‌টুকু ধর্ম কোন্‌টুকু ধর্ম নয়? উত্তর আমাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। এখানে সেই লক্ষণ

দেখিব সেইখানে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিব" [প্রচার, ১ম বর্ষ ১২৯৬/১৮৮৯]

সত্যনির্ণয়ে বঙ্কিমের চিন্তার দৃঢ়তা ও ঋজুতা অবশ্যস্বীকার্য। তিনি মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবন পর্যালোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্যাবহারিক জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণে তাঁর অনাগ্রহ ছিল না। অর্থনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমের বক্তব্য ঋজু ও দৃঢ়,'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭৬) ও 'সাম্য' (১৮৭৯) তার পরিচয়স্থল। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি-ব্যবস্থার আলোচনায় তিনি মুক্ত বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণ এত স্পষ্ট, বক্তব্য এত তীক্ষ্ণ, উপস্থাপনা এত দৃঢ় যে বঙ্কিম-অনুরাগী শিক্ষিত সম্প্রদায় তা সহ্য করতে পারেন নি, কারণ সে সম্প্রদায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্রয়পুষ্ট। বঙ্কিম নিজেও সে সম্প্রদায় ভুক্ত।*

॥ ২ ॥

ভূমিতান্ত্রিক সমাজে রায়তের সমস্যা বড়ো সমস্যা। ভারতবর্ষের কৃষিনির্ভর জীবনে এটা একটা বড়ো ভাবনা। আধুনিক ভারতের মানবতাবাদী চিন্তানায়করা এই ভাবনা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। মানুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি, আমরা লক্ষ্য করেছি, নবযুগের চিন্তার অন্যতম লক্ষণ। রায়তের ভাবনায় তা সমর্থিত হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'রায়তের কথা' (১৯২০/ফাল্গুন ১৩২৬) লেখার কৈফিয়ৎছলে বলেছিলেন,

'রায়তের ভাবনা বাঙালি সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকার চর্চা নয়, এর ভালো ভালো নজির আছে। বাঙালির মধ্যে যে শ্রেণীর লোকেদের আমরা গুরু বলে মান্য করি, তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথায় ব্যথী এবং সে

* 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থের কোনো কোনো অংশ 'সাম্য' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। পরিণত বয়সে বঙ্কিম স্বয়ং 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার রোধ করলে 'বঙ্গদেশের কৃষক' পূর্ণাকারে পুনর্বার প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদেশের কৃষক'এ উল্লিখিত অর্থনৈতিক মতামতগুলি সম্পর্কে পরিণত বয়সে মতানৈক্য স্বীকার করলেও তিনি সেগুলি সংশোধন করেন নি বা 'সাম্য'-এর মত প্রত্যাহার করে নেন নি ."—অসিতকুমার ভট্টাচার্যের প্রাগুক্ত গ্রন্থের পাদটীকা, পৃ ৬১ 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থে (১৮৮৮) 'সাম্য'-এর বিচার সম্পূর্ণ পরিবর্জিত হয়েছিল। পরিণত বঙ্কিমের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটে, তা আমাদের আলোচনার পরিধি-বহির্ভূত।

ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সবাই প্রজার হয়ে ওকালতি করেছেন।

আধুনিক ভারতের ভূমি ব্যবস্থা কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে চাষীর সর্বনাশ ঘটাল, সে বিষয়ে এঁরা সবাই আলোচনা করেছেন। ভূমি ব্যবস্থার গভীর আলোচনার মূল্যের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে জনৈক সমাজতত্ত্ববিৎ যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—

"ভারতবর্ষে শিল্পপ্রাণ সভ্যতা এখনও গড়ে ওঠে নি, গড়তে বহু সময় নেবে। যে সময়ে জগতের বড় বড় দেশ শিল্পসভ্যতার দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছিল সেই যুগেই ভারতবর্ষ ইংরেজ-পদানত হয়ে পড়েছিল; তার ফলে আধুনিক কালের শিল্প গড়ে ওঠা দূরের কথা, যে প্রাচীন হস্তশিল্প তার ছিল সেটুকুও ধ্বংস হয়ে গেল। তাতেও সে রক্ষা পায় নি। ইংরেজ ব্যবসা-বাণিজ্যের ও অর্থের দাবী মেটাবার জন্য ভূমি ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'এ তার অপূর্ব বিবরণী দিয়েছেন। এর আদি এবং নিদারুণ আঘাত পড়ে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশ হতেই ইংরেজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, পলাশির যুদ্ধ হতেই তার অভ্যুদয়। এখানেই তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরা যে প্রথম খাজনা আদায় শুরু করেছিল তাই নয়, সেইসঙ্গে গোমস্তা বা কমার্শিয়াল রেসিডেণ্টরা ব্যবসায়ের জিনিসও সংগ্রহ করত এইখানে। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে ভারত-বিজয়ের বিভিন্ন অভিযানের অর্থও সংগৃহীত হয়েছে প্রধানতঃ বাংলাদেশ থেকেই। মার্কস্ ঠিক এক শ বছর পূর্বে বলেছিলেন ভারতবর্ষ এতকাল বিভিন্ন আঘাতের মধ্যেও যে সমাজ ও যে সভ্যতাকে আঁকড়ে থাকতে পেরেছিল ইংরেজ আমলে আর তা পারবে না, কেননা ইংরেজের থরনখর তার সমাজশরীর ও আর্থিক কাঠামোকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ছে। একথা সত্য সেইজন্য ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস শুধু যে রাজস্ব-আদায় ও রাজস্ব-ব্যবস্থার ইতিহাস তা নয়; সে হল সমস্ত সমাজেরই ইতিহাস, সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের ছবি। ভূমি ব্যবস্থার গভীর আলোচনা হতে এই ছবি যেমন ধরা পড়ে তেমন আর কিছুতেই নয়। সে যুগে সামাজিক জীবনের মূল কেন্দ্রই ছিল ভূমি, কাজেই ভূমি ব্যবস্থার অদলবদল হতে সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত খুব বেশিরকম পাওয়াই

স্বাভাবিক।” [শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্যের ‘বাংলার ভূমি ব্যবস্থা’ পুস্তিকার ভূমিকা। ৭ এপ্রিল ১৩৫৭। ১৯৫০]

বাংলার ভূমি ব্যবস্থার ইতিহাস যে মূলত সমগ্র সমাজেরই ইতিহাস, সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের ছবি,—এই সত্যটি এখানে অল্প কথায় নিপুণভাবে যে সমাজতত্ত্ববিৎ বুঝিয়েছেন, তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী, তার নাম বিমলচন্দ্র সিংহ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। স্বগতের ভাবনা কেন ও কীভাবে সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের ভাবনা হয়ে ওঠে, সে প্রশ্নের উত্তর এখানে পাই।

সাহিত্যিকের এই সামাজিক দায়িত্বের পরিচয় দিয়েছেন যে-সব বাঙালি লেখক, তাঁদের মধ্যে তিনজন প্রধান: বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী।

একথা মনে হতে পারে, বাংলাদেশে জমিদার-প্রথা বিলুপ্তির পর এখন এ সামাজিক দায়িত্ব আমাদের নেই। সে কথা সর্বৈব ভুল।

বিমলচন্দ্র সিংহ পূর্বধৃত ভূমিকা-প্রবন্ধে এ স্পষ্ট করেই বলেছেন—

“পশ্চিমবাংলায় জমিদারী-প্রথার অবসান ঘটে নূতন ভূমি ব্যবস্থার সূচনা হতে চলেছে। এই পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী না হলে যে অর্থনৈতিক সংকটে পশ্চিমবাংলা ক্লিষ্ট সেই সংকট কাটবে না। বস্তুতঃ অনগ্রসর দেশগুলিতে আর্থিক সংকটের যে যে উপাদান পুঞ্জীভূত হবার বিবরণ অর্থনীতির শাস্ত্রে থাকে তার চরম উদাহরণ পশ্চিমবাংলা, একথা অত্যুক্তি নয়। বাহ্য লক্ষণে পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের থেকে শিল্পে অগ্রসর হলেও এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার অবশ্য বহু কারণ আছে। কিন্তু কারণ যাই থাক্, সেই কারণগুলির ভালো করে অনুসন্ধান করে সেগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা যদি না হয় তা হলে পশ্চিমবাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর অসম্ভব চাপ পড়বে। তাতে ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যাহত হবে। সেই কারণে পশ্চিম বাংলায় এমন শিল্পোন্নতির কথাও ভাবতে হবে যে-শিল্পোন্নতি এই সংকট উত্তরণে সাহায্য করে, তেমনই তার পাশাপাশি এমন ভূমি ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে যে-ভূমি ব্যবস্থা তার অনুপূরক হতে পারে। দুটি দিক মিলিয়ে নতুন ধরনের সুদূরপ্রসারী গভীর পরিকল্পনা না হলে এ সমস্যার সমাধান হবে না।”

আজ আঠারো বছর পরে বিমলচন্দ্রের চিন্তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে আছে।

জমিদারী উচ্ছেদ বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনীতিক সংকট সমাধানের শেষ ধাপ নয়, সূচনা মাত্র. এই সত্যটি জমিদারী উচ্ছেদ পরিকল্পনার প্রধান রূপকার পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ও উপলব্ধি করেছিলেন। সে-কারণেই যে-দিন পশ্চিমবাংলায় জমিদারীপ্রথার অবসান ঘটে, সেদিন (১ বৈশাখ ১৩৬২-এপ্রিল ১৯৫৫) এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

"জমিদারী বিলোপ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। পশ্চিমবঙ্গের মৃতপ্রায় পল্লীসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে এবং কৃষি উন্নয়ন কার্যসূচীকে ফলপ্রসূ করিতে রাজ্যসরকার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে কোনো মধ্যবর্তী স্বত্বের অস্তিত্ব বাঞ্ছনীয় নহে। আজ হইতে 'লাঙ্গল যার, জমি তার'। মধ্যস্বত্ব ভোগীরাও আমাদের সমাজনৈতিক কাঠামোর অঙ্গ। ভূমি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহাদের জীবিকার সমস্যা নূতন করিয়া দেখা দিবে। তাই তাঁহাদের স্বাধিকারে রাখিতে দেওয়া হইয়াছে বসতবাটির জমি, ১৫ একর পর্যন্ত খাস অকৃষি জমি, ২৫ একর পর্যন্ত খাস কৃষি জমি, মৎস্য চাষের জন্য পুষ্করিণী, চা-বাগানের জমি ইত্যাদি। জমির যাঁহারা মালিক, তাঁহাদিগকে আমরা নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ দিতেছি। এই অর্থ দ্বারা তাঁহারা শিল্পবাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। সরকার জমিদারী গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১২ লক্ষ বর্গাদার ও ভূমিহীন চাষী পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে। পৃথক পৃথক ভাবে ইহাদের প্রয়োজন মিটাইবার মতো জমি আমাদের নেই। সেইজন্য ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাবিত আইনে আমরা সমবায় কৃষি ও জোতের একত্রীকরণ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতেছি।"

এখানে যে আশা ব্যক্ত হয়েছে, তা আজো ফলবতী হয় নি, সে-কারণে আমাদের সামাজিক দায়িত্বের এখনো অবসান হয় নি,—আশা করি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই তা স্বীকার করবেন।

॥ ৩ ॥

ভূমির উপর চাষীর অধিকার ও স্বত্বস্বামিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেছিলেন। বাংলার চাষী সমাজের দুঃখ ও দারিদ্র্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কত সচেতন ছিলেন, তার প্রমাণ 'বঙ্গদেশের কৃষক'। এই রচনায় তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন—

'লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহাভ্রমে পতিত হইয়া প্রজাদিগের আরো গুরুতর সর্বনাশ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, জমীদারদিগের জমীদারীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব নাই বলিয়াই জমীদারীতে তাঁহাদিগের যত্ন হইতেছে না। জমীদারীতে তাঁহাদিগের স্থায়ী অধিকার হইলে পর, তাহাতে তাঁহাদের যত্ন হইবে। এই ভাবিয়া তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃজন করিলেন। রাজস্বের কণ্ট্রাক্টরদিগকে ভূস্বামী করিলেন।

তাহাতে কি হইল? জমীদারেরা যে প্রজাপীড়ক সেই প্রজাপীড়ক রহিলেন। লাভের পক্ষে, প্রজাদিগের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী, জমীদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিশ যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন। ইহা ভিন্ন প্রজাদিগের আর কোন লাভ হইল না। ইংরাজ রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র। ইংরাজদিগের এ কলঙ্ক চিরস্থায়ী; কেন না, এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী।' [বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ২৬৫-৬৬]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার চাষীর সর্বনাশের কারণ, এ কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। চিন্তার এই স্পষ্টত ও ঋজুতা 'সাম্য' গ্রন্থেও পাই। ভারতের অধঃপতনের কারণ বিশ্লেষণে কোনোরূপ চাতুরীকে প্রশ্রয় না দিয়ে বঙ্কিম সোজাসুজি বলেছেন,

'আমাদের উন্নতির রোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।...

পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে ভারতবর্ষের পূর্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই। এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূলে জ্ঞানোন্নতি, বর্ণবৈষম্য জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল...শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ, সুতরাং অধিকাংশ লোক মূর্খ হইল। মনুষ্যে মনুষ্যে প্রকৃত বৈষম্য আছে। যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে—প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ—তেমনি অপ্রাকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণে শূদ্রে অপ্রাকৃত বৈষম্য।" [সাম্য, সাহিত্য পরিষৎ শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ ৫-৬]

মানুষের সমান অধিকারের এমন অকুণ্ঠ স্বীকৃতি খুব কম লেখাতেই চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে এই কথা উচ্চারণ করেছিলেন। বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মানুষে মানুষে বৈষম্য কৃত্রিম ও পরিহার্য, এবং প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী, জমিদারেরা কস্মিন-কালে কেহ নহেন'—এই দুটি ঘোষণা বাংলা দেশের মানবতাবাদী চিন্তা-ধারায় মূল্যবান সংযোজন।

বাংলার চাষীর অবস্থা পর্যালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছিলেন, শ্রমোপজীবীদের অবনতির মূলে কারণ দুটি—এদেশের ভূমির উর্বরতা ও বায়ুর উষ্ণতা। তার ফলে ধনের তারতম্য ঘটল ও শ্রমোপজীবীর উপর উচ্চবর্ণের প্রভুত্ব বর্ধিত হল। 'এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল।"

বাংলার রায়তকে উচ্চবর্ণ ও ধনী-শাসিত সমাজ যে অবস্থায় রেখেছে, তার ত্রিবিধ ফল বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন:

"শ্রমোপজীবীদিগের অবনতির যে সকল কারণ দেখাইলাম তাহার ফল ত্রিবিধ।

প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা। ইহার নামান্তর দরিদ্রতা।

দ্বিতীয় ফল, বেতনের অল্পতা হইলেই পারশ্রমের আধিক্যের আবশ্যক হয়; কেন না যাহা কমিল, তাহা খাটিয়া পোষাইয়া লইতে হইবে। তাহাতে অবকাশের ধ্বংস। অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। অতএব দ্বিতীয় ফল, মূর্খতা।

তৃতীয় ফল, বুদ্ধ্যুপজীবীদিগের প্রভুত্ব এবং অত্যাচারবৃদ্ধি। ইহার নামান্তর দাসত্ব।

ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুণে স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।" [বঙ্গদেশের কৃষক। তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

এখানে একটি সংশয় থেকে যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সে সংশয় উত্থাপন ও ও নিরাকরণ করেছেন—

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি এ সকল অলঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক নিয়মের ফল, তবে বঙ্গদেশের কৃষকের জন্য চীৎকার করিয়া ফল কি? রাজা আইন করিলে কি ভারতবর্ষ শীতল দেশ হইবে, না জমিদার পীড়নে ক্ষান্ত হইলে ভূমি উর্বরা হইবে? উত্তর, আমরা যে সকল ফল দেখাইতেছি, তাহা নিত্য নহে। অথবা এইরূপ নিত্য যে, যদি অন্য নিয়মের বলে প্রতিহত না হয়, তবেই তাহার উৎপত্তি হয়। কিন্তু ঐ সকল ফলোৎপত্তি অন্য নিয়মের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। সে সকল কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। যদি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বা তৎপূর্বে ইউরোপে গ্রীক-সাহিত্যাদির আবিষ্ক্রিয়া না হইত, তবে এখনকার অবস্থা হইতে ইউরোপের অবস্থা ভিন্ন প্রকার হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জলবায়ুর শীতোষ্ণতা বা ভূমির উর্বরতার বা বাহ্য প্রকৃতির কোন কারণের কিছু পরিবর্তন হইত না।" (তদেব)

বঙ্কিমের এই উত্তরে দুটি মূল্যবান অভিমত আছে। এক আধুনিক ইউরোপের উন্নতির মূল ইতালির রেনেশাঁস। দুই প্রজাসাধারণের দুর্দশার কারণ রাজা ও সমাজের আয়ত্ত। বঙ্কিম যে মানবতাবাদী চিন্তার অংশীদার, তার সর্বপ্রধান পরিচয় এখানে নিহিত।

বঙ্কিমচন্দ্র জমীদার শ্রেণীভুক্ত নন, ইংরেজি শিক্ষিত চাকুরীজীবী ভদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ,—এ কারণেই তিনি জমীদার শ্রেণীর বিরুদ্ধতা করেছেন, এই ভ্রান্ত অভিযোগের উত্তর এখানে পাই। মানবতাবাদই তাঁর চাষী প্রীতির প্রেরণাস্থল। সেকথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন,

"আমরা জমীদারের দ্বেষক নহি, কোন জমীদার কর্তৃক কখন আমাদিগের অনিষ্ট হয় নাই, বরং অনেক জমীদারকে আমরা বিশেষ প্রশংসাভাজন বিবেচনা করি। আমরা যাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাতে

প্রীতিভাজন হওয়া দূরে থাকুক, যিনি আমাদের কথা ভাল করিয়া না বুঝিবেন, হয়ত তাঁহার বিশেষ অপ্রীতিপাত্র হইব। তাহা হইলে আমরা বিশেষ দুঃখিত হইব। কিন্তু কর্তব্য কার্যানুরোধে তাহাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গীয় কৃষকেরা নিঃসহায়, মনুষ্যমধ্যে নিতান্ত দুর্দশাপন্ন এবং আপনাদিগের দুঃখ সমাজমধ্যে জানাইতেও জানে না। যদি মূকের দুঃখ দেখিয়া তাহা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্যব্যয় না করিলাম, তবে মহাপাপ স্পর্শে। আমরা এ প্রবন্ধের জন্য কাহারও নিকট মূর্খ, কাহারও নিকট দ্বেষক, কাহারও নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। সে সকল ঘটে ঘটুক। যদি সেই ভয়ে বঙ্গদর্শন কাতর হইয়া কর্তব্যোক্তি না করে,—পীড়িতের পীড়া নিবারণের জন্য যত্ন না করে,—যদি কোন প্রকারে অনুরোধের বশীভূত হইয়া সত্যকথা বলিতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভাল। যে কণ্ঠ হইতে [illegible] কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল। সে কণ্ঠ নিরুদ্ধ হউক। যে লেখনী আর্তের উপকারার্থ না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফলা হউক।"
[বঙ্গদেশের কৃষক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।]

লক্ষ লক্ষ হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত আর পরাণ মণ্ডলের জন্য মানবতা-বাদী বঙ্কিমের এই সংগ্রাম বাঙালি মনীষার মুক্তচিন্তা, স্বাধীন চিন্তা ও সামাজিক দায়িত্ব স্বীকারের উজ্জ্বল পরিচায়ক।

মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ও সকল মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন—

"তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা।" [সাম্য, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ১৮৭৯]

শতাব্দী প্রান্তে আর এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রতিনিধি কম্বুকণ্ঠে এই কথাই উচ্চারণ করেছিলেন—

"হে ভারত,..... ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।" [স্বামী বিবেকানন্দ, বর্তমান ভারত, রচনা ১৮৯৯]

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার রায়তকে দেখেছিলেন দরিদ্র, মুর্খ ও দাস রূপে। স্বামী বিবেকানন্দ তা'ই দেখেছিলেন। আজো এই দেখা অসত্য হয়ে যায় নি।

শতাব্দী প্রান্তে রমেশচন্দ্র দত্ত 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস'এ ঔপনিবেশিক ইংরেজের দাবি মেটাতে গিয়ে কীভাবে ভারতের ভূমিব্যবস্থা বিপর্যস্ত ও চাষীর সর্বনাশ সাধিত হল, তার বিবরণ দিয়েছেন।

এ সবেরই মূলে আছে সামাজিক দায়িত্ববোধ, যার উৎস মানবতাবাদী প্রেরণা, মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস ও তার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ।

রবীন্দ্রনাথও এই প্রেরণাবলে বাংলার চাষীর দুঃখে কাতর হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জমীদার ছিলেন না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। তিনি কোন্ যুক্তিতে চাষীর অবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"আমার জন্মগত পেশা জমিদারি। কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে, উপার্জন না করে, কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে ঐশ্বর্যভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে তুলি। যারা বীর্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন যোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নয়, গৌরবও নেই।" [রায়তের, কথা আষাঢ় ১৩৩৩, কালান্তর]

বর্তমান সভ্যতার ত্রুটি কোথায়, তা বুঝতে রবীন্দ্রনাথের দেরি হয় নি। ত্রুটি আমাদের বিচ্ছেদের মধ্যে—উৎপাদক ও ভোগকারীর বিচ্ছেদের মধ্যে। এই সত্যটিকে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন, 'কালান্তর' ও 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। আর এই বিচ্ছেদ, অসাম্য ও অবিচারের ফলে প্রলয় যে আসন্ন, তাও উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর কথা এই—

"বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় এক দল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে।......অন্নের উৎপাদন হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ-উপার্জনের সুযোগ ও উপকরণ যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম আরোগ্য আমোদ ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান করে। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা-কিছু পৌঁছয় তা যৎকিঞ্চিৎ। গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহুলোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্পসংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে সভ্যতা বাসা বাঁধে তার বাসা বেশিদিন টিকতেই পারে না।......

মানুষের পরস্পরের মধ্যে দেনা-পাওনার সহজ সামঞ্জস্য সেখানেই চলে যায় যেখানে সম্বন্ধের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। পৃথিবীতে ধন-উৎপাদক এবং অর্থ-সঞ্চয়িতার মধ্যে সেই সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠেছে। তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত ঘরের কাছেই দেখতে পাই। বাংলার চাষী পাট উৎপাদন করতে রক্ত জল করে মরছে, অথচ সেই পাটের অর্থ বাংলাদেশের নিদারুণ অভাব-মোচনের জন্য লাগছে না। এই-যে গায়ের জোরে দেনা-পাওনার স্বাভাবিক পথ রোধ করা, এই জোর একদিন আপনাকে আপনিই মারবে।......

দেওয়া-নেওয়ার সর্বব্যাপী সম্বন্ধ আজ শিথিল। এই সম্বন্ধ-ত্রুটির মধ্যেই আছে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের সূচনা। এক-ধারেই সবকিছু আছে, আর-এক ধারে কোনোকিছুই নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকা কাত হয়ে পড়ে। একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয়। ভূগর্ভ থেকে সেই প্রলয়ের গর্জন সর্বত্র শোনা যাচ্ছে।" ['উপেক্ষিতা পল্লী', ৬ ফেব্রুঅরি ১৯৩৪, পল্লীপ্রকৃতি]

ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন ও চাষীর শোচনীয় আর্থিক দুর্গতির অবসান ঘটানোতে আমাদের মুক্তি নিহিত বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। আর সেই বিশ্বাসবলে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন চাষের উন্নতি ও তার সঙ্গে শিক্ষিতের যোগসাধনও প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে সমবায়-নীতির সার্থকতা আছে বলেই তাঁর ধারণা। এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"তার পরে মাটির কথা, যে মাটিতে আমরা জন্মেছি। এই হচ্ছে সেই গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ করছে। আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দূরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—বর্ষণের যোগের দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে। যদি কেবল হাওয়ায় এবং বাষ্পে সমস্ত আয়োজন ঘুরে বেড়ায় তবে নূতন যুগের নববর্ষা বৃথা এল। বর্ষণ যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু মাটিতে চাষ দেওয়া হয় নি। ভাবের রসধারা যেখানে গ্রহণ করতে পারলে ফসল ফলবে, সে দিকে এখনো কারো দৃষ্টি পড়ছে না। সমস্ত দেশের ধূসর মাটি, এই শুষ্ক তপ্ত দগ্ধ মাটি, তৃষ্ণায় চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে কেঁদে ঊর্ধ্বপানে তাকিয়ে বলছে, 'তোমাদের ঐ যা কিছু ভাবের সমারোহ, ঐ যা-কিছু জ্ঞানের সঞ্চয়, ও তো আমারই জন্যে—আমাকে দাও, আমাকে দাও। সমস্ত নেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। আমাকে যা দেবে তার শতগুণ ফল পাবে।' এই আমাদের মাটির উত্তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস আজ আকাশে গিয়ে পৌচেছে, এবার সুবৃষ্টির দিন এল বলে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাষের ব্যবস্থা চাই যে।"
['পল্লীর উন্নতি,' বৈশাখ ১৩২২/১৯১৫, পল্লীপ্রকৃতি]

ভূমিমাতার আর্ত ক্রন্দন ও চাষীর কাতর রোদন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বলেই তিনি এমন করে চাষীর দুঃখ শিক্ষিতের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছিলেন, আমাদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন—

ফিরে চল্ মাটির টানে—
যে মাটি আঁচল পেতে
চেয়ে আছে মুখের পানে।

এই আহ্বান আজ পর্যন্ত বাস্তবে রূপ পায় নি বলে চাষীর দুঃখের আজো অবসান হয় নি।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের মতই জমিদার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তিনিও মানবতাবাদী বলে চাষীর দুঃখ নিরাকরণেই আমাদের মুক্তি নিহিত বলে বিশ্বাস করতেন। আপন শ্রেণীচেতনার অহমিকাগর্ব থেকে তিনি মুক্ত হতে পেরেছিলেন, জমির উপর রায়তের স্বত্বস্বামিত্ব স্বীকার করেছিলেন।

তিনি বিদ্রূপ করে বলেছেন,

"যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারও মতে সে বল্‌শেভিক, কারও মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে-বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের মারামারি-কাটাকাটির পক্ষপাতী।'

এসব অপবাদ অমূলক বলে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন। নিজের সম্পর্কে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন,

'বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কুসংস্কার আমার নেই, এবং থাকতে পারে না। আমার মন স্বতঃই এঁদের প্রতি অনুকূল, কেননা আমার আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার—কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ, অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়।'

তথাপি প্রমথ চৌধুরী সমস্ত ব্যক্তিগত বিবেচনা বাদ দিয়ে রায়তের কথা ভেবেছিলেন ও তার দুঃখমোচনে লেখনীধারণ করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয় প্রমথ চৌধুরী সেই মানবতাবাদী লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, যারা মানুষের সমানাধিকারে বিশ্বাসী ও সকল মানুষকে যোগ্য মর্যাদা দানে অভিলাষী।

'রায়তের কথা' (১৯২০ প্রবন্ধ সংগ্রহ ১) একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। বাংলার চাষীর দুর্গতিমোচনে দেশের দুর্গতিমোচন, কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধনেই আমাদের যথার্থ উন্নতি এবং চাষীর অবস্থার উন্নতি সাধনে আমাদের আত্মনিয়োগ করা উচিত: এই বিশ্বাস 'রায়তের কথা'য় উচ্চারিত হয়েছে।

খুব স্পষ্ট ভাষায় এই সত্যের প্রতি প্রমথ চৌধুরী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—

'বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে কৃষকের শরীর মন যদি অসার হয়, তা হলে জমিকে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানবজমিন, আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা।

এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এ দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে।'

দেশের অগ্রসর অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামাজিক দায় ও কর্তব্যের রূপরেখাটি এই বক্তব্যে নিপুণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বাংলার রায়তকে মূর্খতা দারিদ্র্য দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দানই সকল পোলিটিক্যাল প্রোগ্রামের মূল কথা, এই বিশ্বাস প্রমথ চৌধুরী জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশে দশশালা বন্দোবস্ত (১৭৮৯) ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) ইতিহাস প্রমথ চৌধুরী নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাতে এ বর্ণনা সাহিত্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার ইতিহাস-মূল্য নষ্ট হয় নি। মুঘল আমলের শেষভাগ থেকে বৃটিশ আমলের একাল (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) পর্যন্ত বাংলাদেশে রায়তের অবস্থার হের-ফের তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে দুএকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ অবশ্য কর্তব্য।

"আজ প্রায় দেড় শ বৎসর ধরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, রায়তের আর যাই থাক, জমির উপর কোনোরূপ মালিকীস্বত্ব নেই, এবং পূর্বেও ছিল না। লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার।… …

যে চষে, জমি তার। এবং সে জমির উৎপন্ন ফসলে প্রথমে রাজার তারপর আর পাঁচজনের, যথা, গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর কামার প্রভৃতিরও ভাগ বসাবার অধিকার আছে।……এই ছিল ভারতবর্ষের সনাতন প্রথা।……

এক কথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা। আর তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এ রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরেজিতে যাকে বলে ট্যাক্স-কলেক্টর, অর্থাৎ জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপর কমিশন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারিতে তহশিলদারেরা পেয়ে থাকে।……

জন্ কোম্পানি কিন্তু এদেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে শুদ্ধ করলেন, এই সম্বন্ধ উল্টে ফেলে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার

হলেন বাংলার মাটির স্বত্বাধিকারী, আর প্রজা হল তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী।"

এইভাবে প্রমথ চৌধুরী ঝরঝরে ভাষায় নিপুণ ভঙ্গিতে বাংলার রায়তের অবস্থা ও তার আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখেছেন, কিন্তু তাঁর হাতে তা হয়ে উঠেছে রায়তের 'কথা'। গল্পের মতই এ বিবরণ সুখপাঠ্য ও চিত্তগ্রাহী।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' প্রবন্ধে (১৮৭৯) বাংলার চাষী পরাণ মণ্ডল যে উচ্চকুলজাত মহারাজাধিরাজের সমকক্ষ, এ সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—

'এক্ষণে এ সকল কথা অধিকাংশের অগ্রাহ্য এবং মূর্খের নিকট হাস্যের কারণ। কিন্তু একদিন এইরূপ বিধি পৃথিবীর সর্বত্র চলিবে।'

বঙ্কিমচন্দ্র ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীকে স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং প্রজাসাধারণের দুঃখাবসানের আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেছিলেন।

চল্লিশ বছর পরে প্রমথ চৌধুরী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের সুদূর পরিণাম অনুমান করে 'রায়তের কথা'র (১৯২০) উপসংহারে মন্তব্য করেছেন—

"আজকের দিনে প্রজার সকল দাবি আইনতঃ গ্রাহ্য হলে প্রজা যে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; এবং জমিদার বর্গের নিকট সনির্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ বিষয়ে প্রজার স্বার্থের হন্তারক না হন। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, আজকের দিনে কেউ তা বলতে পারে না। তবে একথা ভরসা করে বলা যায় যে, গত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় সকল সমাজের, কি আর্থিক কি রাজনৈতিক, সকল ব্যবস্থারই গোড়া আলগা হয়ে গেছে; সুতরাং আমরা যদি আগে থাকতেই সমাজের নতুন ঘর বাঁধতে শুরু না করি, তাহলে দুদিন বাদে হয়তো দেখতে পাব যে আমাদের মাথা লুকোবার আর স্থান নেই, আমরা সব রাস্তায় দাঁড়িয়েছি।

অন্ধকার রাত্রির গর্ভ থেকে যেমন নতুন প্রভাত জন্ম নেয়, তেমনি আশাহীন ভরসাহীন জীবন ও অত্যাচারের মধ্য থেকেই এক সুখী মুক্ত জীবনের আশার অংকুর দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সকলে সেই আশায় বিশ্বাস এবং আসন্ন প্রলয়ের গর্জন শুনেছিলেন।

এখানেই তাঁরা মানবতাবাদী চিন্তানায়করূপে দেখা দিয়েছিলেন। দেশ ও সমাজের প্রতি তাঁরা দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি। জীবনের সত্যকে আড়াল করে রাখেন নি এবং আপন শ্রেণীগত স্বার্থ বর্জন করে আসতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

প্রমথ চৌধুরী সমস্ত হৃদয় ও মন দিয়ে নোতুনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, যা প্রাণের ও প্রগতির বিরোধী, তা'ই পুরাতন, তা'ই জড়। "জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে।" (নূতন ও পুরাতন) 'রায়তের কথা'য় সেই সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১২ | প্রমথ চৌধুরী ও উত্তরকাল

ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে প্রমথ চৌধুরীর মজলিশে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে যাঁরা যোগ দিতেন, তাঁরাই সবুজপত্রগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই অভিজাত বিদগ্ধ পরিবেশে যে আবহাওয়া বিরাজ করত, তা কোনো দেশ-কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ ছিল না। নির্বিশেষ সংস্কৃতি-সাধনাই এই মজলিশের একমাত্র সাধনা ছিল। সবুজপত্র (১৯১৪) এই গোষ্ঠীর চিন্তার আধার। এই গোষ্ঠী বিশ শতকের বাঙালির মানস-জীবনে স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই মজলিশ সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

সবুজপত্রীদের স্মৃতিচারণায় শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন: "সেই গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁদের কথা আমার বিশেষ করে মনে আছে, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সবাই সংস্কৃতি-জীবনে প্রথিতযশা হয়েছেন।" ('চলমান জীবন', ১ম পর্ব, পৃঃ ২২০)। এর সঙ্গে আরো দুটি নাম যোগ করা প্রয়োজন: সুরেশ চক্রবর্তী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী।

এই লেখক-তালিকা সযত্নে অনুধাবন করলে দেখা যায়, এঁদের লেখার মূল সুর এক, তা হল মননশীল যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ আলোচনার সুর। সবুজপত্রের এটি প্রধানতম সুর।

অন্যতম সবুজপত্রী ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আমরা ও তাঁহারা' প্রবন্ধগ্রন্থে এই আসর সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থের নব সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৫৬) তিনি বলেছেন: "আমি যে দলে মানুষ হয়েছি তাকে Pramathean কিংবা সবুজপত্রের দল বললেই বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ আমাদের বই পড়ার অভ্যাস ও বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তর্কপ্রবৃত্তির জন্যই প্রমথবাবু নিজের কাছে আমাদের

টেনে নেন ও শিক্ষা দিয়ে সবুজপত্রের দল তৈরী করেন। সেখানে অভিব্যক্তিবাদ, নতুন ফিজিক্‌স্‌, নতুন অর্থনীতি আর নব্যদর্শন নিয়ে আলোচনা অসামাজিক বিবেচিত হত না। বের্গসঁ, ম্যাক্‌স্‌ প্ল্যাঙ্ক, বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর মতামত, সংস্কৃত কি আধুনিক কবির ছন্দোবিচারের ফলে তখনকার দিনে আমরা একঘরে হইনি।"

কেবল বের্গসঁ, প্ল্যাঙ্ক ও রাসেল নয়, এইসঙ্গে শ, ক্রোচে, ফ্রয়েড, য়ুং, অ্যাডলার, অয়কেন প্রমুখ ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দের বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস বিষয়ক মননশীল আলোচনায় সবুজপত্রীরা মনোযোগ নিবদ্ধ করেছিলেন। এর ফলে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে একটি নোতুন যুগের সূচনা হল: তা মননশীল আলোচনার ধারা। সে আলোচনা জগদ্ধিতায় বা সমাজকল্যাণে নিয়োজিত নয় ; তার ভিত্তি যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, তার লক্ষ্য বুদ্ধির মুক্তি, তার সাধনা নির্বিশেষ সংস্কৃতি সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তদ্গত আলোচনা। প্রকাশভঙ্গীর সারল্য, অনায়াসস্বচ্ছন্দ কথ্য গদ্যরীতি, তীক্ষ্ণ সজাগ বুদ্ধিবৃত্তি: সবুজপত্রের সকল রচনাতেই উপস্থিত। সবুজপত্র কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যচর্চার বাহন ছিল না, ব্যাপকতর অর্থে সাহিত্যের বহুবিস্তৃত আলোচনা এই পত্রে গ্রথিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, অলংকার-শাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, প্রত্নতত্ত্ব: সকল বিষয়ে স্বচ্ছন্দ মানস-পরিভ্রমণের পরিচয় সবুজপত্রের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। সবুজপত্র ফলত: সুকর্ষিত বিদগ্ধ মানসিকতার পরিচায়ক।

॥ ২ ॥

অন্যতম সবুজপত্রী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষ্যে ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়ির মজলিশের চেহারা সুন্দর ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, "এই মজলিশটি হল সাহিত্যিক মনের রসায়ন। বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্যের রচনারীতি স্বভাবত এখানে প্রায়ই আলোচনা হত। কিন্তু আলোচ্য বস্তুর তা ছিল অংশমাত্র। দেশবিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দেশী বিদেশী রাষ্ট্রব্যাপার কিছুই বাদ যেত না। সব বিষয়ের অল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞ দু-একজন করে মজলিশে ছিলেন। তবে সব

আলোচনায় সকলেই যোগ দিতেন, এবং আলোচনার ধারা এমন ছিল অবিশেষজ্ঞের মন ও বুদ্ধি যাতে উৎসুক ও উন্মুখ হযে ওঠে। কোন বিষয়ে নূতন ভাল বই কি বেরিয়েছে সে খবর এখানে আদান-প্রদান হ'ত, আর সে পুঁথি সংগ্রহ করে পড়া ছিল অনেক মজলিশির অবশ্য কর্তব্য। বেশির ভাগ বইএর খবর প্রমথবাবুই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তাঁর বই মজলিশিদের হাতে হাতে ফিরত। বাঙালী লেখকদের মনের পুঁজি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের মনের পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ—এটা ছিল মজলিশের অকথিত স্বীকৃতি। আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে চলত। আলোচনায় লক্ষ্য ছিল, এসব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তার বোঝা না হয়ে ওঠে। বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড় নামই থাক না কেন। 'বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি'—তা সে বেদ সংস্কৃতেই লেখা হোক, কি ইংরেজি ফরাসি জার্মান ভাষাতেই লেখা হোক। বলা বাহুল্য বহু বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা, ও যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ দুটি ছিল প্রমথবাবুর মনের প্রতিচ্ছবি। মজলিশিদের অল্পবিস্তর সমধর্মী মনে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একদিন দেশের প্রাচীন ভাবধারাকে যাচাই করেছিল পাশ্চাত্ত্য ভাবের নূতন আলোতে। সবুজপত্রের যুগে প্রয়োজন হয়েছিল এই নূতন ভাবকে যাচাই করার। সে প্রয়োজন এখনও আছে। প্রমথবাবু আমাদের উৎসাহিত করতেন এই নূতন ভাব ও সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাব ও সাহিত্যের আলোতে পরীক্ষা করতে। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সভ্যতা সচল ও সৃষ্টিকুশল ছিল তার সঙ্গে প্রমথবাবুর মনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর নিজের মন এই ঘনিষ্ঠতার দিকে আমাদের অনেকের মনকে অনুকূল করেছিল।" [বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের এই সাক্ষ্য গোষ্ঠীপতির কৃতিত্বের পরিচায়ক। আবেগপ্রবণ যুক্তিবিরোধী ভাবালু বাঙালি মনকে আবেগমুক্ত নির্মোহ যুক্তি ও বুদ্ধির রাজপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরী দাবি করতে পারেন। এবং এ দাবি যথার্থ। এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমথ চৌধুরীর দুটি

কৃতিত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভট্টবানের ভাষায় সে ত্রুটির বিবরণ দেওয়া যায় এই কথায়—তিনি "প্রবর্তয়িতা গোষ্ঠীবন্ধানম্" এবং "অখিল কলাকলাপলোচনকঠোরমতিঃ নিখিলশাস্ত্রাবগাহনগভীরবুদ্ধিঃ।"

গোষ্ঠীপতি প্রমথ চৌধুরীর নেতৃত্ব আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রের অংশবিশেষের উদধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ সে পত্রে বলেছেন: "আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড়ো করে আমার মনে পড়ে। তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্ত-বৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গশিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার স্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন তাহলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশি নির্বিকার তাঁর মন যে বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি, মুশকিল এই যে বাঙালী কাউকে কোন একটা দলে না টানলে বুঝতেই পারে না।" (দ্রঃ 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', পৃঃ ।৶০, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত।)

॥ ৩ ॥

প্রমথ চৌধুরীর এই 'বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা'র প্রভাব সবুজপত্রীদের উপর যতটা কার্যকরী হয়েছিল, পরবর্তীদের উপর ততটা কার্যকরী হতে পারে নি। উত্তরকালের উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব আলোচনায় এ সত্যটি অবশ্যস্বীকার্য।

সবুজপত্রীরা যে প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিচয় এখানে জানা প্রয়োজন। 'অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত করার দুরূহ ক্ষমতা' ও 'কলার অমূল্য আত্মসংযম': এ দুটির উপর তিনি বারবার জোর দিয়ে এসেছেন। সবুজপত্রীরা সযত্নে এই শিক্ষাকে নিজেদের রচনায় আয়ত্ত করেছেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পণ্ডিচেরি) রচিত 'সবুজকথা' গ্রন্থে এর সমর্থন পাই এই ক'টি কথায় —"শব্দের দেহায়তন যত বাড়বে অর্থের মূল্যও যে তত বাড়বে এ ভুল আমাদের প্রমথবাবু ভেঙেছেন। শব্দকল্পদ্রুমের বাইরেও যে চিন্তাশীলতার অবসর আছে তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।" সংযত তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য ও পরিহাসপ্রবণতা—যা প্রমথ চৌধুরীর লেখার বৈশিষ্ট্য—তা এখানে বর্তমান।

অপর প্রধান লেখক ধূর্জটিপ্রসাদের রচনায় যুক্তিধর্মিতা ও মননশীলতার পরিচয় পাই। তিনি জীবনে বিজ্ঞানচিন্তার প্রভাব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন: "মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় সামাজিক উন্নতির পথে অন্তরায় রয়েছেন। অথচ শিক্ষা চাই, অবসর চাই, ভদ্রতা চাই। সমস্যা যদি এই হয়, তাহলে কর্তব্য হচ্ছে, সুদূরকে নিকট করে, পৃথককে যোগসূত্রে বেঁধে, বিরোধকে সৃষ্টির কাজে এনে নতুন সমাজ গড়ে তোলা। একটি উপায় শিক্ষা, তবে সে শিক্ষার মানে সাহিত্যের অনার্স নয়। সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে এবং শিক্ষিতের মধ্যে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসারের দ্বারা বিরোধের আংশিক অবসান হবে আশা করি। কারণ সৃষ্টির প্রধান কথা জ্ঞান, ভাবের আবেগ নয়; এবং সে জ্ঞান যত ইহজগতের হয় ততই ইহজগতের মঙ্গল। বিজ্ঞানই ইহজগতের জ্ঞানের মধ্যে একমাত্র পদ্ধতি যাকে বিশ্বাস ও নির্ভর করা যায়; বিস্তর দোষ থাকা সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই সাহায্যে কুসংস্কার ও স্বার্থপরতা দূর হয়, অজ্ঞানের বোঝা কমে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় ও বহুদূর পর্যন্ত চলে।" ['আমরা ও তাঁহারা', মুখবন্ধ, ১ম সং, ১৯৩১]

আধুনিক বিশ্ববিদ্যার চর্চা সবুজপত্র মজলিশে হত। উপরিধৃত মনোভঙ্গী তারই ফল। চিন্তার শৈথিল্য, ভাষার জড়তা, প্রকাশভঙ্গীর অসারল্য ও অস্পষ্টতা, ভাবাবেগের অতিরেক, বুদ্ধির উপরে বোধির আধিপত্য—প্রমথ চৌধুরী গ্রাহ্য করেন নি এবং এদের বিরুদ্ধেই তাঁর বিদ্রোহ।

সবুজপত্র সেই বিদ্রোহের পরিচয়স্থল। বুদ্ধির মুক্তি ও বিশ্ববিদ্যার নির্মোহ চর্চা করে তিনি বাঙালীকে বিশ্বনাগরিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। সবুজপত্রীরা সে সাধনার সাক্ষ্য। Reason ও Scepticism, যুক্তি ও সন্দেহপ্রবণ বিচারমুখিতা প্রমথ চৌধুরীর আয়ুধ এবং এই সংগ্রামে স্বচ্ছ প্রসাদগুণসমন্বিত কথ্য গদ্যরীতি তাঁর বাহন। ইহজীবন সম্পর্কে সদাজাগ্রত কৌতূহল ও অতন্দ্র বিচারবুদ্ধি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বিশ শতকের গোড়া থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চল্লিশ বছর ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে গিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত পঁচিশ বছরের পর্বটিকে (১৯১৪-১৯৩৯) 'সমৃদ্ধি-পর্ব বলে নির্দেশ করা যায়। 'ভারতী', 'সাহিত্য', 'সবুজপত্র', 'বিচিত্রা', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'বসুমতী' ও 'প্রবাসী': এই সাতটি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে বেশির ভাগ লেখাই সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়।

॥ ৪ ॥

১৯১৪-১৯৩৯: এই পঁচিশ বছরের যে পর্ব, সে সময়ে প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধির মুক্তি ও যুক্তির আশ্রয়ের জন্য অভিযান চালিয়েছেন। বিচার্য এই: প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব সমকালে ও উত্তরকালে সবুজপত্র-গোষ্ঠীর বাইরে কতদূর ও কতটা বিস্তৃত হয়েছিল? রবীন্দ্র-যুগের মধ্যপর্বে সাহিত্যে বিদ্রোহের ঝোড়ো হাওয়া নিয়ে এলেন প্রমথ চৌধুরী। সাহিত্যে কথ্যভাষার ব্যবহার ও দুরূহ চিন্তার বিষয়কে সহজ সরল করে উপস্থিত করার প্রয়াস তিনি করলেন। বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার চর্চা, যুক্তিধর্মিতা সবুজপত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই প্রভাব বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী ও দূরপ্রসারী হল না। যা ছিল বিদগ্ধ মানসের প্রকাশ, তা হয়ে দাঁড়াল আভিজাত্যগর্বী সংকীর্ণ আত্মম্ভরিতা। যার সূচনা হল ভাবালুতা ও জোলো রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে, তার পরিণতি হল দলগত স্বৈরাচারিতে। কেন এমন হল?

১৯১৪—১৯৩৯: এই পঁচিশ বছরের পর্বে যে ক'টি সাহিত্যপত্রকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকগোষ্ঠী বর্তমান ছিল, তাদের পরিচয় উদ্ঘাটনেই

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে 'সবুজপত্র' (১৯১৪) ছাড়া অন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্র ছিল এইগুলি: সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' (১৮৯০), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' (১৯০১), ফণীন্দ্রনাথ পালের 'যমুনা' (১৯০৯), জলধর সেনের 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩)। এর পর এই পর্বের প্রসিদ্ধ সাহিত্যপত্র হিসাবে নাম করা যায় এগুলির—মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতী' (১৯১৫), চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' (১৯১৫), জগদিন্দ্রনাথ রায়ের 'মানসী ও মর্মবাণী' (১৯১৬), বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গবাণী' (১৯২১), হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মাসিক 'বসুমতী' (১৯২২), নজরুল ইসলামের পাক্ষিক 'ধূমকেতু' (১৯২২), দীনেশরঞ্জন দাসের 'কল্লোল' (১৯২৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কালিকলম, (১৯২৬), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা' (১৯২৭), সজনীকান্ত দাসের মাসিক 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৭) এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' (১৯৩১)। এই ক'টি সাহিত্যপত্রিকাকে কেন্দ্র করে গুটি দশেক সাহিত্য-গোষ্ঠী এই পর্বের কলকাতায় দেখা যায়। সবুজপত্র-গোষ্ঠী নিঃসন্দেহ এদের অন্যতম, কিন্তু প্রধানতম নন।

এখানে তিন শ্রেণীর সাহিত্যপত্র লক্ষ্য করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে রক্ষণশীল রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যপত্র: সাহিত্য, ভারতবর্ষ, নারায়ণ, বঙ্গবাণী, বসুমতী। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে রবীন্দ্রগুণমুগ্ধ সাহিত্যপত্র: ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, প্রবাসী, বিচিত্রা। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে সাহিত্য আধুনিকতার পতাকাবাহী প্রগতিশীল সাহিত্যপত্র; ধূমকেতু, কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি, পরিচয়। শেষোক্ত শ্রেণীর পত্রগুলির রবীন্দ্রবিরোধিতা রবীন্দ্র-স্বীকৃতির নামান্তর এবং এদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতাও প্রবল।

প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্র-গুণগ্রাহী, কিন্তু অন্ধ রবীন্দ্র-স্তাবক নন। সবুজপত্র সম্বন্ধে একই মন্তব্য করা চলে। সেইজন্য রবীন্দ্রবিরোধী ও রবীন্দ্রভক্ত কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গেই সবুজপত্রের চিন্তাক্ষেত্রে ঐক্য ঘটে নি, বরং বিপরীতটাই ঘটেছে। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যপত্র ও সাহিত্যিকদের আক্রমণ থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রানুসারিতাও তাঁর কাম্য ছিল না।

অপরপক্ষে, কল্লোল-কালিকলম-এর জীবন-দর্শন তিনি গ্রহণ করেন নি। শনিবারের চিঠি যেমন কল্লোল-কালিকলম-এর অতি-তারুণ্যকে তীব্র উপহাস করেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরীর বৈদগ্ধ্যকেও আক্রমণ করেছে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বাংলা সাহিত্যে না পড়ার জন্য দুজন দায়ী হতে পারেন—কবিতাক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কথারাজ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহগামীরা কবিতারাজ্যে যে পরিবেশ গড়ে তুললেন, তা একান্তভাবে রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রকাব্যাদর্শ তাঁরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেন ও রোমান্টিক কাব্যসাধনাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য বলে পরিগণিত হল। ফলে 'সনেট-পঞ্চাশৎ' (১৯১৩) বা 'পদচারণ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থ দুটির যুক্তিভিত্তিক বুদ্ধিগ্রাহ্য কাব্যাবেদন বাঙালি পাঠকের কাছে ব্যর্থ হল। কল্লোল-কালিকলম-এর আধুনিক কাব্যসাধনার পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পল্লীকেন্দ্রিক ঐতিহ্যপ্রেমী ভগবৎবিশ্বাসী রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসী জীবনদর্শনের প্রাধান্য ছিল। তারপর কল্লোল-কালিকলম-এ (১৯২৩-২৬] রবীন্দ্র-কাব্যদর্শনের বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা গেল। বিশ্বাস, আস্তিকতা, রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিবর্তে এল সন্দেহ, সংশয়, নৈরাশ্য,, নাস্তিকতা ও বাস্তবমুখিতা। নজরুল-মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-প্রেমেন্দ্র-বুদ্ধদেব-অচিন্ত্য প্রমুখের কাব্যসাধনায় পেলাম দেহাতীত কল্পকামনার পরিবর্তে বাস্তবের ক্ষুধাতৃষ্ণার বন্দনা, পেলাম সচেতন দুঃখবাদ, আত্মদ্রোহিতা, রোমান্স-বিরোধিতা, পেলাম সচেতন রাজনৈতিক চেতনা, পেলাম গণমানসের বিক্ষোভের কাব্যরূপ। ঐতিহ্যানুস্মৃতির স্থানে এল যুগচেতনা, শান্তির পরিবর্তে সংশয়, রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যানের পরিবর্তে রূঢ় নিষ্ঠুর বাস্তবের রূপায়ণ। কিন্তু কবি প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত আবেগরহিত মননকে এঁরা কাব্যের উপজীব্য বলে মেনে নিলেন না।

কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব যুগলক্ষণাক্রান্ত ঘটনা। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপূর্ণ তির্যক জীবন-সমালোচনা—যা 'চার ইয়ারি কথা'য় (১৯১৬) দেখা গেল তা কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর লেখকদের বা শরৎচন্দ্রকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে নি। শরৎচন্দ্রের মূলধন হৃদয়াবেগ, কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর মূলধন রবীন্দ্রনাথের কথায় 'দারিদ্র্যের আস্ফালন

ও লালসার অসংযম'। প্রমথ চৌধুরী যেখানে শ, রাসেল, বের্গসঁর ভক্ত, সেখানে এঁরা স্কাণ্ডিনেভীয় কথাকার ও ইংরেজী গল্পকারদের অনুসারী। এঁদের আরাধ্য রোলাঁ, হামসুন, জোহান বোয়ার, হাক্সলি, লরেন্স। আসলে সবুজপত্রের সাধনা বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতার সাধনা, কল্লোল-কালি-কলমের সাধনা আবেগপ্রধান অতিতরল তারুণ্যের সাধনা। সবুজপত্রের মূল ফসল প্রবন্ধের ফসল, কল্লোল-কালিকলমের মূল ফসল গল্প-উপন্যাস-কবিতা। বরং কল্লোলপন্থীরা শরৎচন্দ্রের নিকটবর্তী, প্রমথ চৌধুরী থেকে অনেক দূরে তাঁদের অবস্থিতি। প্রমথ চৌধুরী হতে চেয়েছিলেন র‍্যাশনালিস্ট, কল্লোলপন্থীরা হয়েছিলেন ইমোশনালিস্ট। তাই এই দুইয়ের মিলন তৃতীয় দশকে ঘটেনি, ঘটার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। ফলে প্রমথ চৌধুরীর যুক্তি, বুদ্ধি ও মননচর্চা একটি সীমাবদ্ধ অভিজাত সাহিত্যগোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে রইল, তা বহুপ্রসারী হতে পেল না। প্রমথ চৌধুরী কবিতা-গল্পে বাঙালিকে ভাবালুতা ও আবেগপ্রাধান্য থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ এবং ভারতী-মানসী ও মর্মবাণী-কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠী তাঁর সে সাধনাকে ব্যাহত করে দিলেন।

তবে কি প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব এই পর্বে কারুর উপরেই পড়ে নি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, সে প্রভাবের একমাত্র শুভকর পরিচয় পাই ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' পত্রিকায় (১৯৩১)। 'পরিচয়'-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুললেন, তাঁদের উপদেষ্টা ছিলেন প্রমথ-শিষ্য ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সেই সূত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। 'পরিচয়ের প্রথম যুগের কবিতা ও প্রবন্ধে (এ দুটি প্রধান ফসল) সবুজপত্রের আদর্শের অনুসরণ ও সার্থক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পরিচয়পন্থীরা আবেগমুক্ত যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ নির্বিশেষ সংস্কৃতি-সাহিত্য-সাধনায় বিশ্বাস করতেন। মননশীল প্রবন্ধ রচনায় পরিচয়-গোষ্ঠীর লেখকদের কৃতিত্ব প্রমথ-প্রভাবেরই পরিচয়স্থল। এই সময়ের নবসাহিত্যপত্র 'বিচিত্রায়' (১৯২৭) আরেকজন মননশীল লেখকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল, তিনি অন্নদাশংকর রায়। সবুজপত্র-গোষ্ঠীর বাইরে সুধীন্দ্রনাথ ও অন্নদাশংকর—কেবল এরা দুজন প্রমথ চৌধুরীর যোগ্য শিষ্য।

আপন লেখায় প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব নির্ণয় করে অন্নদাশংকর লিখেছেন: "তখনকার দিনে 'সবুজপত্র' যে একশ্চন্দ্র ছিল তা নয়।

মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস কথাটা অত্যুক্তি। বাংলা মাসিকপত্রের সেইটেই ছিল অষ্টবজ্রসম্মিলন। এতগুলি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা একই সময়ে প্রকাশিত হয় নি তার আগে কিংবা পরে। এতগুলি প্রথম শ্রেণীর লেখকেরও একই সময়ে আবির্ভাব হয় নি। 'সবুজপত্রে'র যুগ কেবল 'সবুজপত্রে'রই নয়, আরো পাঁচ সাতখানা আদর্শবাদী মাসিকের। তাদের সকলের আদর্শ অবশ্য এক ছিল না, কতকটা পরস্পরবিরোধী ছিল। কিন্তু বিরোধ যদি আন্তরিক হয়ে থাকে তবে তাতেও প্রগতির সাহায্য হয়। আমি তখন নগণ্য বালক মাত্র। কিন্তু আমারও সাধ যেত বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে। 'সবুজপত্রে', প্রবাসী'তে, 'ভারতী'তে লিখতে। বিশেষ করে 'সবুজপত্রে'। পরে আমার লেখা 'প্রবাসী'তে, 'ভারতী'তে ছাপা হয়েছে। কিন্তু 'সবুজপত্রে' হয় নি, 'সবুজপত্র' আমার নজরে পড়ে নি। 'সবুজপত্রে'র লেখক হবার সাধ আমার মেটে নি, তবু আমি 'সবুজপত্রে'রই একজন। আর কোনো পত্রিকার সঙ্গে আমার মনের মিল, প্রাণের মিল, দিলের মিল এতখানি হয় নি। এমন কি 'বিচিত্রা'র সঙ্গে, 'পরিচয়ে'র সঙ্গেও না। 'কল্লোলে'র সঙ্গে তো নয়ও। অথচ এদের সঙ্গেই আমার লেখক সম্পর্ক। এরাই আমাকে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এদের গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি একসূত্রে বাঁধা। 'বিচিত্রা'র 'পথে প্রবাসে' পড়ে চৌধুরী মহাশয়ের ভালো লাগে। সেই প্রথম আমার অস্তিত্ব তাঁর নজরে এল। তার আগে তিনি আমাকে চিনতেন না। তারও দুবছর পরে (১৯২৯) প্রথম দেখা।

পিছন ফিরে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হচ্ছে স্টাইল। আমাকে আকর্ষণ করেছিল 'সবুজপত্রে'র লেখক বীরবলের তথা প্রমথ চৌধুরীর লিখনশৈলী। তারপর সুরেশ চক্রবর্তীর স্টাইল। বলা বাহুল্য স্টাইল হচ্ছে মানুষটা। এঁরা আমাকে অলক্ষ্যে সাহায্য করেছেন। আমার নিজের স্টাইল তৈরি হয়েছে এঁদের সঙ্গে সংগত রেখে। এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। যে রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা'র লেখক, 'লিপিকা'র লেখক। আর কারো কারো নাম করা উচিত। তাঁদের সবাই কিন্তু 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর নন। স্টাইল বলতে আমি বুঝি প্রসাদগুণ। মাত্রাজ্ঞান। বাক্‌সংক্ষেপ। লক্ষ্যভেদ। মাধুর্য। কিন্তু ধ্বনির খাতিরে ধ্বনি নয়।

স্টাইলের জন্য আমাকে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে শিক্ষানবীশী করতে হয়েছে। তাঁর অজ্ঞাতে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা আর্ট সম্বন্ধে আমার যে ধারণা সে ধারণা আমি তাঁর কাছেই পেয়েছি। এবং তিনি পেয়েছেন যতদূর বুঝি ক্রোচের কাছে।" ['প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি', আধুনিকতা ১৯৫৩/'প্রবন্ধ'-এ সংকলিত,

॥ ৫ ॥

উত্তরকালের উপর প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বহুবিস্তারী ও দূরপ্রসারী নয়, তা আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতে হয়। তবে বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতা ও বিশ্বনাগরিকতায় তিনি বাঙালি পাঠককে দীক্ষা দিয়েছেন, তা অবশ্যস্বীকার্য। কথ্যরীতিতে মননশীল আলোচনার প্রবর্তক-রূপে তাঁর নাম অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে কীর্তিত হবে। কোনো দেশের মন সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে পারে না যদি তা—reason ও rationalism-এর চর্চা না করে, এ শিক্ষা তিনিই আমাদের দিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী মূলত 'এসেয়িষ্ট'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত মোটামুটি পঁচিশ বছর প্রমথ-প্রবন্ধাবলীর রচনাকাল। এই কালে তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, অন্যতম সবুজপত্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত তার মূল্য নিরূপণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার শেষে এই মূল্যায়ন আমাদের জানা প্রয়োজন, কেননা তার থেকেই উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের উপর প্রমথ-প্রভাব কতটা, তা আমরা জানতে পারি। অতুলচন্দ্রের দৃষ্টিতে সে প্রভাব এই—

'প্রবন্ধগুলি যখন সবুজপত্রে প্রকাশ হচ্ছিল তাদের শব্দচয়ন ও শব্দগ্রন্থনের কৌশল, সংহত প্রকাশের পারিপাট্য পাঠকের মনকে যে সবচেয়ে দখল করেছিল তাতে আশ্চর্য কিছু নেই। বলার ভঙ্গির বলার বিষয়কে মনে ছাপিয়ে উঠেছিল। কিন্তু যে অংশটা প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার একান্ত নিজস্ব তা ছাড়া তাঁর রচনারীতি বাংলা গদ্যরচনা, প্রবন্ধ ও সমধর্মী রচনাকে বহুল প্রভাবিত করেছে, লেখকদের জ্ঞানে ও অজ্ঞাতে। সাধু বনাম চলিত

ভাষার তর্কে প্রমথ চৌধুরীর জয়ের চিহ্ন যেমন আজ বাংলা গদ্যরচনার সারা শরীরে, তেমনি তার রচনারীতির প্রভাব বাংলা গদ্যে আজ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্-প্রমথ যুগের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, তার গতি অনাড়ষ্ট, জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের প্রসাদগুণ তার অনেক বেশি। এর মূলে প্রমথ চৌধুরীর আদর্শের প্রভাব অনেকখানি। বাংলা গদ্যের ভাষা ও রচনারীতিতে তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বড দান বলে তা স্বীকৃত হবে। কিন্তু তাঁর বলার ভঙ্গিতে তাঁর বলার বিষয় যদি চাপা পড়ে তা হবে দেশের দুর্ভাগ্য। এই ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। সে কথা বলার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এবং আজকের দিনে তার প্রযোজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি।' [প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংগ্রহের ভূমিকা, শ্রাবণ ১৩৫৯]

তাঁর কোন্ শিক্ষা আজ আমরা গ্রহণ করব ? এর জবাব তাঁর ভাষাতেই দিই। নিম্নধৃত উদ্‌ধৃতিটিতেও তিনি আমাদের—বাঙালি লেখক ও পাঠককুলকে—যে পথের নির্দেশ দিয়েছেন, তা যদি পালন করি, তবে বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বরাজ্য আমরা লাভ করতে পারব, এ বিশ্বাসে এই আলোচনার সমাপ্তি। তিনি বাংলা দেশের সাহিত্যের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে এই ধ্রুব সত্য উচ্চারণ করেছেন, "বঙ্গসাহিত্য যতদিন কেবল-মাত্র গল্প ও গানের গণ্ডির ভিতর আটক থাকবে, ততদিন শিক্ষিত সমাজে বঙ্গভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি হলেও সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; নিকৃষ্ট কাব্য-সাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোনো সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না; কেননা যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তন সংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা। এবং সকলেই অবগত আছেন যে প্রতিভাশালী লেখক এবেলা ওবেলা হাটে বাজারে মেলে না। হালে বঙ্গসাহিত্যের একটি নূতন চাল দেখে আমি ঈষৎ ভীত হয়ে পড়েছি। সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারে বেজায় ধুম পড়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য ভয়ের কারণ থাকত না, যদি না সাহিত্যে রসের লোভে তার সারের দিকটা উপেক্ষা করবার সম্ভাবনা এসে পড়ত। কদলীবৃক্ষের

অন্তরে সার নেই, আছে কেবল রস ; সে কারণ আমরা যদি বঙ্গসাহিত্যে সেই নিটোল সুগোল মসৃণ চিক্কণ নধর সরস বৃক্ষের চাষের প্রশ্রয় দিই, তাহলে বঙ্গসরস্বতীর কপালে নিশ্চয়ই শুধু কদলীভক্ষণই লেখা আছে। এস্থলে আমি সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভাষার উৎপত্তি কর্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। ভাষা ব্যতীত চিন্তা প্রকাশ করবার অপর কোনো উপায় নেই। অপর পক্ষে আমরা যাকে বলি রস, আর ইংরেজরা ইমোশন—সে বস্তু প্রকাশ করবার নানা উপায় আছে, যথা, স্বেদ কম্প মূর্ছা বেপথু শীৎকার চিৎকার প্রভৃতি। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে।······বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থা আমাদের কাছে মোটেই সন্তোষজনক নয়। বঙ্গসরস্বতী কালে যে আমাদের মনোজগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হবেন, এই দুরাশাই আমাদের উচ্চ আশা।" ('বাংলার ভবিষ্যৎ', সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩২৪)।

অর্ধশতাব্দী পরে ও প্রমথ চৌধুরীর এই উপদেশ ও আশার প্রয়োজন ফুরোয় নি।